মৃত্যুদূত

[মৃত্যু সম্পর্কে একটি শিক্ষনীয় উপন্যাস]

শায়েখ আব্দুল্লাহ্ আল মনীর

প্রথম প্রকাশ

এপ্রিল-২০১৪

জমাদিউস্ সানি-১৪৩৫

প্রিন্টিং ও বাঁধাই

মুসলিম ফটোস্ট্যাট এ্যান্ড কম্পিউটিং

দর্শনা, চুয়াডাঙ্গা।

মুল্যঃ ৭০ টাকা।

এক.

সোহান এক নজরে তাকিয়ে থাকে বৃদ্ধ লোকটির দিকে। মাথার চুল উষকো-খুষকো, পোশাক-আশাক বেজায় বেখাপ্পা। সব মিলিয়ে চেহারায় একটা পাগলাটে ভাব। সোহানের পাশের সীটে বসার পর থেকে বিভিন্ন উল্টো-পাল্টা প্রশ্ন করে তাকে বিরক্ত করছে এই বৃদ্ধ লোকটি। ধোপাখালী স্টেশন থেকে ট্রেন ছাড়ার পর থেকে সোহানের পাশের সীটটি খালিই ছিল। বেশ কিছুক্ষণ একা একা মুখ বুজে থেকে সে বিরক্ত হয়ে উঠেছিল। তার মনে হয়েছিল পাশে অন্য কোনো যাত্রী থাকলে তার সাথে বাক্যালাপ করে সহজে সময় পার করা যেতো। তার ধারণা এখন পুরোপুরি ভুল প্রমাণিত হয়েছে। দেখা যাচ্ছে পাশের যাত্রীটি বাক্যালাপের পরিবর্তে বাক্যের অপলাপ করে চলেছে। বাঁচাল প্রকৃতির লোকেরা মানুষকে কি রকম প্যাঁচালে ফেলতে পারে সেটা এখন বোঝা যাচ্ছে। এই লোকটির সাথে এসব অর্থহীন প্রশ্নোত্তরে জড়িয়ে পড়ার কোনো আগ্রহ আপাতত সোহানের নেই। সে এমন ভাব করে যেনো লোকটির কোনো কথা তার কানে ঢোকেনি। লোকটির দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে ট্রেনের জানালা দিয়ে বাইরের দৃশ্য মনোযোগ দিয়ে দেখতে থাকে সে। এটা তার ছোট বেলার অভ্যাস। কখনো বাসে বা ট্রের চড়ার সুযোগ হলেই সে উদাসভাবে জানালার দিকে তাকিয়ে থাকে। মানুষের জীবন যে কত বিচিত্র হতে পারে সেটা তখন সে অনুধাবন করে। একের পর এক গ্রাম-গঞ্জ, শহর, মাঠ-ঘাট, প্রান্তর অতিক্রম করে ট্রেন এক স্টেশন থেকে আরেক স্টেশনে যাত্রা করে। এর মাঝে কত মানুষের কত রকম জীবনচিত্র ফুটে ওঠে। নানা মানুষের জীবনের মাঝে সোহান নিজের জীবনকে মিলিয়ে ফেলে। রাস্তার পাশে এক বৃদ্ধ মিঠাই বিক্রি করছে ৮/৯ বছরের একটা ছোট বাচ্চা তার কাছ থেকে মিঠাই ক্রয় করছে। পাশে আরেক জন বাদাম বিক্রি করছে। এক ঝাঁক পাখি দিগন্তে পাখা মেলে উড়ে যাচ্ছে। কখনও কখনও সারি সারি গাছ সকল দৃশ্যকে চোখের আড়াল করে দিচ্ছে। কিছুক্ষণ পরই নতুন কোনো দৃশ্য ভেসে উঠছে। হয়তো একটি খোলা মাঠে একপাল গরু-ছাগলের চরে খাওয়ার দৃশ্য বা ছোট বাচ্চাদের খেলা-ধুলার দৃশ্য। একেকটি দৃশ্য সামান্য সময়ের জন্য চোখে ভেসে উঠছে আবার সময়ের অতল সাগরে হারিয়ে যাচ্ছে। একের পর এক দৃশ্যের পট পরিবর্তন হচ্ছে অনেকটা সিনেমার দৃশ্যের মতো। তবে সিনেমার দৃশ্যগুলো হয় ধারাবাহিক, একটা দৃশ্যের সাথে অন্যটার সম্পর্ক থাকে। কিন্তু এই দৃশ্যগুলো বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত। একটার সাথে অন্যটার কোনো সম্পর্ক নেই। হয়তো কখনও সম্পর্ক হবেও না। কিংবা কে জানে হয়তো সম্পর্ক রয়েছে। এগুলো তো এই পৃথিবী, প্রকৃতি এবং মানুষের জীবন চিত্রের সাথে সম্পর্কিত। প্রত্যেকটি ঘটনা তো অন্যটির সাথে সময়ের শিকলে বাঁধা। এভাবে চিন্তা করলে একটি দৃশ্য অন্যটি হতে কোনো ভাবেই আলাদা নয়।

এসব ভাবতে ভাবতে সোহান নিজেকে হারিয়ে ফেলে। সে এখন কোথায় আছে, কোথায় যাবে সব কিছু ভুলে যায়। পাশে বসে থাকা বৃদ্ধ লোকটি বেশিক্ষণ নীরবতা ধরে রাখতে পারলেন না। সোহানের দিকে চেয়ে তিনি বললেন,

- আমার প্রশ্নের উত্তর কিন্তু পেলাম না!

ভাল একটা স্বপ্ন ভেঙে ঘুম থেকে উঠলে মানুষ যেমন অপ্রস্তুত হয়ে যায় সোহানের সেই অবস্থা হয়। কিছুক্ষণ আমতা-আমতা করে সে বলে,

- কোন প্রশ্ন? কীসের প্রশ্ন?

- এরই মধ্যে ভুলে গেলে? আমি প্রশ্ন করেছিলাম, তুমি কি মৃত্যুকে বিশ্বাস করো?

এবার সোহানের সব কিছু মনে পড়তে থাকে। সে ধোপাখালী থেকে ট্রেনে উঠেছে মতিচুরে যাওয়ার জন্য। এই পন্ডিত ভাবাপন্ন বাঁচাল প্রকৃতির বৃদ্ধ লোকটি বেশ কিছুক্ষণ হলো তার পাশে বসেছে। এরই মধ্যে নিজের পাণ্ডিত্য জাহির করতে লোকটি কিছু জটিল প্রশ্ন করেছে এবং সোহান সদুত্তর দানে ব্যর্থ হলে লোকটি দার্শনিক কায়দায় এমন সব ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ শুনিয়েছে যা জ্ঞান বৃদ্ধির পরিবর্তে কেবলই বিরক্তির উদ্রেক করে। এধরনের বিরক্তি থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য সে অনেক চেষ্টা-চরিত্র করেছে কিন্তু সে চেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়ে লোকটি আবার তাকে প্রশ্নের ফাঁদে জড়ানোর চেষ্টা করছে। তার এই প্রশ্নটি অবশ্য জটিল কোনো প্রশ্ন নয়। তবে এর মধ্যে বোকামী রয়েছে। মৃত্যুকে বিশ্বাস করে না এমন লোক কি পৃথিবীতে পাওয়া সম্ভব! হিন্দু, বৌদ্ধ, আস্তিক, নাস্তিক সবাই তো মৃত্যুকে বিশ্বাস করে। নিজের সামনে জ্বলজ্যান্ত মানুষ ছট-ফট করে মরে যায়। সন্ত্রাসীরা বোমা মেরে, গুলি করে কত লোক হত্যা করে। পত্র-পত্রিকায় এসব তো প্রায়ই হেডলাইন হয়। এসব দেখেও কি কেউ মৃত্যুকে অবিশ্বাস করতে পারে? কোনো পাগলের পক্ষেও এই প্রশ্ন করা সঙ্গত নয়। তবে এই লোকটির কথা ভিন্ন। তিনি দেখতে পাগলাটে ধরনের হলেও পাণ্ডিত্য জাহিরের চেষ্টা করছেন। এই প্রশ্নের আড়ালে তার অন্য কোনো উদ্দেশ্য রয়েছে। প্রশ্নের উত্তর দিলেই তিনি দার্শনিকের মতো সেটার ত্রুটি প্রমাণ করে সঠিক উত্তর প্রদান করে বাজিমাত করে দেওয়ার চেষ্টা করবেন। তার চেয়ে বরং প্রশ্নটি এড়িয়ে যাওয়াই মঙ্গলজনক। সোহান ভিন্ন প্রসঙ্গে আলোচনার চেষ্টা করে।

- আপনার নাম কি জানতে পারি?

প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে ভিন্ন প্রসঙ্গে আলোচনার মোড় ঘুরানোর কারণে লোকটি কিছুটা বিরক্ত হয়েছে বলে মনে হলো। জোর করে মুখে হাসি ধরে রাখার চেষ্টা করে বলল,

- আমি মৃত্যুদূত। যারা আমাকে চেনে তারা আমাকে এ নামেই ডাকে।

"মৃত্যুদূত" শব্দটি শুনেই সোহানের চোখ চড়ক গাছে উঠে পড়ে। ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে বলে,

- ইয়ে, মানে আপনার নাম "মৃত্যুদুত"? এটা আবার কেমন নাম?

- এটা আমার নাম নয়, এটা আমার কাজ।

- কাজ? .. মানে? আপনি কি মৃত্যুর ফেরেশতা আ .... আ ....

সোহানের মুখ দিয়ে কথা বের হয় না। তার আগেই লোকটি সশব্দে হেঁসে ওঠে।

- না-না, ভয়ের কোনো কারণ নেই। আমি আজরাইল নই। একেবারে মাটির মানুষ। এই যে দেখো, রক্ত-মাংসের শরীর।

সোহান পর্যবেক্ষনের দৃষ্টিতে বৃদ্ধের শরীরের দিকে তাকায়। লোকটার বয়স সত্তরের কাছাকাছি হবে নিশ্চয়। গাঁয়ের চামড়া স্থানে স্থানে জড়ো হয়ে গেছে। শরীর যে মাংসের তা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে কিন্তু ভিতরে রক্ত আছে কি না সেটা নিশ্চিত নয়। ঘটনা যাই, হোক পাশে বসে থাকা এই লোকটিকে মানুষ হিসেবে কল্পনা করাই বেশি নিরাপদ। সরাসরি মৃত্যুর ফেরেশতা বা দুষ্টু জিন হলে তো খবর খারাপ।

- কী ভাবছো? এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না? তবে এই নাও, ছুয়ে দেখো।

কথাটি শেষ করেই খপ করে সোহানের হাত চেপে ধরে বৃদ্ধ লোকটি। হঠাৎ হকচকিয়ে যায় সোহান। নিজের অজান্তাতেই সজোরে চিৎকার করে ওঠেসে। আতংকে তার অন্তর-আত্মা লা-পাত্তা হওয়ার উপক্রম হয়। সারা শরীর থর-থর করে কাঁপতে থাকে। তার বেহাল দশা দর্শন করে লোকটির মনে মমতার উদ্রেক হলো বলে মনে হয়। তিনি সোহানের হাত ছেড়ে দিয়ে তার মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বলেন,

- বোকা ছেলে, সন্ধ্যা রাতে ঘর ভর্তি লোকের সামনে এত ভয় পেলে মানুষে কি বলবে?

লোকটির কথা শুনে সোহান সত্যিই সংকোচ বোধ করে। আড় চোখে দেখার চেষ্টা করে অন্যরা তার দিকে তাকিয়ে আছে কিনা। এক ঘর লোকের সামনে তো আর বোকামী করা সাজে না।

যাত্রীরা নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত। কেউ বাদাম খাচ্ছে, কেউ একটু ঠেস দিয়ে ঘুমিয়ে নিচ্ছে। মাঝখানে কয়েকজন তরুণ নিজেদের মধ্যে আড্ডা দিচ্ছে। একেবারে পিছনের দিকে কিছু বখাটে ছেলে সিগারেট ফুঁকছে। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে তাদের কেউই সোহানের চিৎকার শোনে নিঅথবা শুনলেই তাতে কর্ণপাত করে নি।

- তুমি নিশ্চিন্ত থাকো। ওরা কেউ তোমার কথা শোনে নি। যদি এদিকে কেউ খুন

হয়ে যায় তাও ওরা টের পাবে না।

খুন হয়ে যাওয়ার কথা শুনে সোহানের অন্তরে পূনরায় কম্পন সৃষ্টি হয়। অসহায় শিশুর মতো বৃদ্ধ লোকটির দিকে তাকিয়ে থাকে সে। এই লোকটি কি তাকে খুন করতেই এসেছে, না কি মানুষকে ভয় দেখিয়ে কাবু করাই এর কাজ?

- দুঃখিত, তুমি কিনা ভয় পেয়েছো আর আমি তোমাকে খুনো-খুনির কথা শোনাচ্ছি। আসলে, বয়স হয়েছে তো। কখন কি কথা বলতে হয় তা আর মাথায় ধরে না। দেখো আমি তোমাকে ইচ্ছা করে ভয় দেখানোর জন্য এসব বলছি না বাপু। তুমি আবার ভুল বুঝো না।

- না-না আমি মোটোও ভয় পায় নি। ভয় পাওয়ার কি আছে? আপনি কি বাঘ যে আমার রক্ত চুষে খাবেন?

- এই একটা ভুল কথা বললে বাছা। বাঘে কি আর মানুষের রক্ত চুষে খায়? খেলে কিছু মাংস খায় হয়তো। রক্ত চুষে খায় রাক্ষস আর ডাইনিরা। ছোট বেলায় নিশ্চয় এসব গল্প পড়েছো। কি- পড়ো নি? এসবই অবশ্য কেবল রূপকথা। তবে বাস্তবে ঘটতেও তো পারে, কি বলো?

সোহান বুঝতে পারে লোকটি ইচ্ছা করে তাকে ভয় দেখানোর চেষ্টা করছে। সে প্রসঙ্গ পরিবর্তন করার চেষ্টা করে। বৃদ্ধ লোকটি রক্ত চোষা রাক্ষসের ভিন্ন কোনো গল্প শুরু করার পূর্বেই অন্য কোনো বিষয়ে আলোচনা শুরু করা দরকার।

- তা আপনি এখন যাচ্ছেন কোথায়?

- আমি যাচ্ছি সফদারপুরে।

- সেখানে আপনার স্থায়ী বাসস্থান বুঝি?

- বোকার মতো কথা বলো না, বাছা। মানুষ কি গাছ যে শিকড় লাগিয়ে কোথাও ঠাঁই দাড়িয়ে থাকবে? মরা মানুষের কথা অবশ্য ভিন্ন। সারাদিন কবরে শুয়ে থাকে। লাশ হয়ে যাওয়ার পূর্বে মানুষ স্থায়ী ভাবে কোথাও বাস করে না, বুঝলে?

সোহান ইতস্তত করে নিজের প্রশ্নটি সংশোধন করে বলে,

- আমি বলতে চাচ্ছি আপনার বাড়ি কি দফাদারপুরে?

- কি মুশকিল! আমি দফাদারপুরের কথা কখন বললাম? আমি তো বললাম, আমি সফদারপুরে যাচ্ছি।

- ওহ্! ভুল হয়ে গেছে। মোট কথা, আপনি কি ঐ এলাকার বাসিন্দা?

- না, বেটা। তা নয়। আসলে, সফদারপুরে আমার এক খালাতো ভায়ের বন্ধুর বাসা।

তারই একজন প্রতিবেশী গত কয়েকদিন থেকে মৃত্যুশয্যায়। তার উদ্দেশ্যেই আমি এখন সফদারপুরে রওনা দিয়েছি।

এই বৃদ্ধ লোকটি মৃত্যুশয্যায় শায়িত একজন রোগীকে দেখা-শোনা করতে রওয়ানা হয়েছে শুনে সোহানের পুলকিত হওয়ার কথা ছিল কিন্তু তার বদলে তার পিলে চমকে যায়। মৃত্যুদূত নামের এই লোক মৃত্যুশয্যায় শায়িত লোকটির কাছে যাচ্ছে কেন? তার জীবন প্রদীপ নির্বাপণ করাই কি তার উদ্দেশ্য? বিষয়টি ভাবতেই সোহানের লোম খাড়া হয়ে যায়। আতংকিত হয়ে বলে,

- আপনি কি ঐ ব্যক্তির জান কবজ করার জন্য যাচ্ছেন?

জান কবজ করার কথা শুনে বৃদ্ধ লোকটি যেনো আকাশ থেকে পড়লেন। বিষম বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন,

জান কবজ করবো, আমি? কি আশ্চর্য! এমন অলক্ষণে কথা কেনো বলছো, বাছা?

- না, আপনি বললেন, আপনাকে সবাই মৃত্যুদূত বলে ডাকে- তাই..।

বৃদ্ধ লোকটি এবার ঘটনা বুঝতে পারেন। আলোচনার প্রথম পর্বেই যে নিজের পরিচয় প্রকাশ করে দিয়েছেন তা বোধ হয় তার মনে ছিল না। কৌতুকের স্বরে হাসতে হাসতে বললেন,

- ও আচ্ছা। এই ব্যাপার? দেখো আমি বলেছি, আমি মৃত্যুদূত। আমি কিন্তু একবারও বলিনি আমি মানুষের জান কবজ করি।

বলে আবার হো হো করে হাসতে থাকে বৃদ্ধ। সোহানের মনে হয় এই হাসির মধ্যে অনেক রহস্য লুকিয়ে আছে। এই বৃদ্ধ লোকটি তার নিকট থেকে কিছু আড়াল করছে অথবা তাকে সসর্ব মিথ্যা কথা শোনাচ্ছে। এসব রহস্যের সমাধান করার কোনো স্পৃহা বা ইচ্ছা তার অন্তরে স্থান পেয়েছিল কিনা সেটা সে নিজেও জানে না। শুধু এতটুকু সত্য যে, এই বৃদ্ধ লোকটির সাথে আলাপ-আলোচনা করার ব্যাপারে এখন সে কিছুটা আগ্রহী হয়ে উঠেছে। ট্রেনের জানালা দিয়ে নানা মানুষের নানা রকম বৈচিত্র অবলোকন করার চেয়ে ট্রেনের ভিতরে নিজের পাশে বসে থাকা একজন ব্যক্তির মধ্যে যে রহস্য লুকিয়ে আছে তা খুঁজে বের করা এখন আরো বেশি উপভোগ্য মনে হচ্ছে তারনিকট। অনেকটা কৈফিয়ত চাওয়ার ভঙ্গিতে সে বলে,

- তাহলে বলুন, মৃত্যু শয্যায় শায়িত একটা ব্যক্তির নিকট আপনি কেনো যাচ্ছেন?

- কেনো আবার! একজন মানুষ মৃত্যুমুখে পতিত আরেকজন মানুষকে দেখতে যায় না বুঝি?

বৃদ্ধ নিতান্ত সহজভাবে কথাটি বললেও সোহানের নিকট ব্যাপারটি সহজ মনে হয়

না। সে ভীষণ অবাক হয়। খালাতো ভায়ের বন্ধুর প্রতিবেশীর অসুখ-বিসুখে যে লোক ছুটে যায় তিনি যে অত্যন্ত জনহিতৌশী তাতে সন্দেহ করা চলে না। কিন্তু এভাবে নিজের চাচাতো, ফুফাতো ভাইদের এবং তাদের বন্ধু ও বন্ধুর প্রতিবেশীদের অসুখ-বিসুখে খোঁজ-খবর করতে হলে তো রোজ পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত ছোটা-ছুটি করা লাগবে। এই বৃদ্ধ কি তাই করে নাকি?

- দেখুন, আপনার কথা আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না। আপনার একার পক্ষে অসংখ্য, অগনিত লোকের অসুখ বিসুখে খোঁজ-খবর করা কীভাবে সম্ভব?

- অসংখ্য, অগনিত লোক তুমি পেলে কোথায়? আমি তো বললাম একজন লোকের কথা। একজন লোককে কত সংখ্যা দিয়ে গুণ করলে অসংখ্য হয় সে অংকটা কি তোমার জানা আছে?

বৃদ্ধ লোকটি দর্শন ও যুক্তি বিদ্যা শেষ করে এখন অংক শেখাতে শুরু করেছে দেখে সোহান কিছুটা সতর্ক হয়ে যায়। মাধ্যমিক স্কুলে লেখা-পড়া শেষ করে কলেজে প্রবেশ করলেও অংকে সে এখনও খুব কাঁচা। অংক শব্দটি শুনলেই তার জমির স্যারের কথা মনে পড়ে। রুপনগর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিদ্যা অর্জনের সময় জমির স্যার তাদের অংকের ক্লাশ নিতেন। জমির স্যারকে সবাই বলতো 'জম' স্যার। সত্যিই তিনি জমই ছিলেন। এমনিতে কথা বলতেন খুব সাজিয়ে গুছিয়ে। ছাত্রদের সব কিছু ঠিক-ঠাক বুঝিয়ে দিতে কোনো ত্রুটি করতেন না। কিন্তু এর পর কেউ বুঝতে না পারলে তিনি বেজায় ক্ষেপে যেতেন। হাতের কাছে যা পেতেন তাই দিয়ে পিটিয়ে পিঠ বাঁকা করে দিতেন। একদিন তিনি সোহানদের ক্লাসে এসে বললেন,

ছোট ছেলে-মেয়েরা অংককে ভীষণ ভয় পায়। তারা নাসিরুদ্দিন হোজ্জা আর গোপাল ভাড়ের গল্প পড়তে পছন্দ করে। কিন্তু মনে রেখ অংক কোনো ভয়ংকর বস্তু নয়। একজন ভাল শিক্ষকই পারেন বাচ্চাদের অংকভীতি দূর করতে। বাচ্চারা গল্প পছন্দ করে। শিক্ষকদের উচিৎ গল্পের মাধ্যমে অংক শেখানো। এটিই সঠিক পদ্ধতি। আজ আমি তোমাদের গল্পের মাধ্যমে অংক শেখাবো। তোমরা সবাই রাজি আছো তো?

বুঝে হোক না বুঝে হোক ক্লাসের সব ছাত্ররা স্যারের প্রস্তাবে রাজি হয়ে যায়। অন্তত একটি দিন জমির স্যারের বকুনি আর পিটুনির বদলে মিষ্টি মিষ্টি গল্প শোনা গেলে ছোট ছেলে-মেয়েরা তাতে নারাজ হবে কেন?

জমির স্যার নিজেকে ভাল শিক্ষক প্রমাণ করার জন্য তৎক্ষনাৎ নতুন পদ্ধতিতে অংক শেখানোর কাজ শুরু করলেন। প্রথমেই তিনি একটি গল্প শুরু করলেন,

- একজন লোক পাঁচটি মিষ্টির হাড়ি নিয়ে মেয়ের বাড়ি যাচ্ছিল। দুপুর বেলা প্রচন্ড রোদের মধ্যে সে রাস্তা দিয়ে হেটে যাচ্ছিল। রাস্তার পাশে ছিল একটি বট গাছ। অনেক হাটা-হাটি করে ক্লান্ত হয়ে লোকটি বট গাছের ছায়ায় বসে পড়লো। বট

গাছের নিচে ঠান্ডা বাতাসে লোকটির ঘুম এসে গেলো। একপাশে হেলান দিয়ে সে ঘুমিয়ে পড়লো। কাছেই একটি খেলার মাঠে এক পাল ছেলে-পুলে খেলা করছিল। মিষ্টির হাড়ি পাশে রেখে লোকটিকে ঘুমাতে দেখে তারা চুপি-চুপি এসে এক হাড়ি মিষ্টি সাবাড় করে পালিয়ে গেলো।

জমির স্যার এখানেই গল্প শেষ করেন। তিনি এখন এই গল্পের আলোকে অংক শেখানো শুরু করবেন। এই হচ্ছে তার নতুন পদ্ধতি। মজার মজার গল্প শুনতে শুনতে অংশ শেখা। একজন সাহিত্যিক হলে তিনি নিশ্চয় বুঝতেন গল্পের সমাপ্তি না হলে তা শুনে কেউ কখনো তৃপ্তি পায় না। অসমাপ্ত গল্প মানুষের মনকে কেবলই তিক্ত ও বিরক্ত করে। কিন্তু জমির স্যার সাহিত্যিক নন, তিনি গণিতের শিক্ষক। অংক শেখানোর জন্য তার মন আকু-বাকু করছিল। গল্প বলা তার কাজ নয়। লোকটি ঘুম থেকে উঠে কি করলো এবং ঐ সকল দুষ্টু ছেলেদের কি শাস্তি হলো সেটা বর্ণনা না করেই জমির স্যার এবার অংক শেখাতে মনোনিবেশ করেন। বাচ্চাদের দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে তিনি বললেন,

- বলো তো এক হাড়ি মিষ্টি খেয়ে নেওয়ার পর আর কটি হাড়ি অবশিষ্ট ছিল?

ক্লাসের ছাত্ররা সবাই ছিল সমান প্রকৃতির গবেট। এমনিতেই হিসাব-নিকাশে তারা কাঁচা তার উপর মাঝ পথে গল্প বন্ধ করে অংক শেখানো শুরু করে জমির স্যার তাদের মাথা আওলিয়ে দিয়েছেন। এখন তাদের মাথায় সহজ বা কঠিন কোনো কিছুই ঢুকবে নাএটাই স্বাভাবিক। স্যারের প্রশ্ন শুনে সবাই তাই নিরব হয়ে গেলো। অংক শেখার নতুন পদ্ধতিটি পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছে দেখে জমির স্যার রেগে অগ্নিস্বর্মা হয়ে গেলেন। টেবিলে রাখা লাঠিটি হাতে নিয়ে হুংকার ছেড়ে বললেন,

- এই সহজ অংকটার উত্তর বলতে পারবি নে? পিটিয়ে আজ তোদের দাতের পাটি খুলে দেবো। এই রহিম দাড়া। কয়টি হাড়ি অবিশষ্ট ছিল বল।

রহিম সাধারনত পিছনের বেঞ্চে বসে। দূর্ভাগ্যের কারণে আজ সামনে পড়ে গেছে। স্যারের প্রশ্ন শুনে সে থতোমতো খেয়ে যায়। মোটা-সোটা লাঠিটির দিকে বার কয়েক দৃষ্টি দিয়ে সে বলে, আর পনেরটি হাড়ি অবশিষ্ট থাকে স্যার! প্রায় সাথে সাথেই বেচারার পৃষ্ঠদেশে সপাৎ সপাৎ করে লাঠির বাড়ি পড়তে থাকে।

- পাঁচটি হাড়ি মিষ্টির মধ্যে এক হাড়ি মিষ্টি খেয়ে নিলে আর পনেরটি হাড়ি অবশিষ্ট থাকে? তুমি কোন জঙ্গলের গাধা হে?

সোহান তাকিয়ে দেখলো স্যার একের পর এক ছাত্রদের দাড় করিয়ে গরুপেটা করতে করতে সাইক্লোনের মতো তার দিকে ধেয়ে আসছেন। মাঝে আর মাত্র পাঁচ সাত জন রয়েছে। তাদের পিটুনি ক্রিয়া শেষ করতে স্যারের মিনিট কয়েক লাগবে। এরই মাঝে অংকটার সমাধান করা দরকার। সে অংকটা নিয়ে চিন্তা শুরু করে।

প্রথমে তার অংকটি খুব সহজ মনে হচ্ছিল। পাঁচ হাড়ি মিষ্টির মধ্যে এক হাড়ি খেয়ে নিলে আর চারটি হাড়ি থাকবে এটাই স্বাভাবিক। তবে এই দুর্যোগের সময় কেবল অনুমানের উপর নির্ভর করা ঠিক হবে না, বিষয়টি সরজমিনে তদন্ত করা দরকার।

সোহান কল্পনা করে, একজন লোক বট গাছের নিচে নাক ডেকে ঘুমাচ্ছে। তার পাশে পাঁচটি মিষ্টির হাড়ি রাখা আছে। সোহান ভাল করে কয়েকবার গুনে দেখে- এক, দুই, তিন চার, পাঁচ - এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ ...। এরই মধ্যে কিছু দুষ্টু ছেলে মিষ্টির উপর আক্রমণ করে এক হাড়ি মিষ্টি খেয়ে নিল। সোহান কল্পনা করে তাদের মধ্যে সেও রয়েছে। মিষ্টি খেয়ে পালাবার আগে সে হাড়ি গুলো আবার গুনে দেখলো। কি আশ্চর্য! এক হাড়ি মিষ্টি খাওয়ার পরও পাঁচটি হাড়ি অবশিষ্ট রয়েছে। হাড়ি থাকার কথা চারটি কিন্তু গুনে দেখা যাচ্ছে পাঁচটি। ঘটনা খুব সুবিধের মনে হচ্ছে না। এই দুটি উত্তরের কোনটি বললে যে জমির স্যারের পিটুনি থেকে রেহাই পাওয়া যাবে তা সে বুঝতে পারে না। তবু নিজে হাতে গণনা করে যে ফলাফল পাওয়া গেছে সেটার উপর নির্ভর করাই তার নিকট বেশি নিরাপদ মনে হয়।

চিন্তা করার জন্য এরচেয়ে বেশি সময় পাওয়া গেল না। ইতোমধ্যে জমির স্যার সোহানের পাশের ছেলেটিকে পিটাতে আরম্ভ করেছেন। লাঠির সপাৎ সপাৎ শব্দের সাথে সাথে ছেলেটির বাপরে, মারে আর্তনাত শোনা যাচ্ছে।

সোহানের সব কিছু গুলিয়ে যায়। নিজের নাম কি সেটাও সে ভালভাবে স্মরণ করতে পারে না। সঠিক উত্তরটি মনে রাখার জন্য সে মনে মনে বার বার পাঁচ, পাঁচ বলতে থাকে। শেষে স্যার যখন বললেন,

- এই তুই বল, তাড়াতাড়ি বল।

সোহান উঠেই বলল,

- স্যার পাঁচ।

উত্তরটি শুনে স্যার কিছুক্ষণ চিন্তা করে নিলেন। প্রথমে মনে হলো তিনি খুশিই হয়েছেন কিন্তু পরক্ষণেই বাঘের মতো গর্জন করে উঠলেন,

- পাঁচ? পাঁচটি হাড়ির মধ্যে একটি হাড়ি খেয়ে নিলে আর পাঁচটি থাকে?

কথাটি শেষ করতে না করতে সোহানের পিঠে দামাদম বেত পড়তে থাকে। সোহান তখন নিজের ভুল বুঝতে পারে। দুষ্টু ছেলেরা যে মিষ্টির সাথে সাথে মিষ্টির হাড়িটিও খেয়ে নিয়েছিল সেটা সে পুরো ভুলে গিয়েছিল। তা হলে তো উত্তর চারই হওয়ার কথা। সে তাড়াহুড়া করে বলে,

- স্যার চারটি হাড়ি ছিল।

উত্তর শুনে জমির স্যার বেজায় খুশি হলেন। তার পা যেনো আর ভূমিতে পড়ে না। মাঝ পথে প্রহার থামিয়ে তিনি সোহানকে আদর করতে শুরু করেন। এখন তার মনে হচ্ছে নতুন পদ্ধতিতে অংশ শেখার কার্যক্রম কিছুটা হলেও সফল হয়েছে। সোহানের মনে কিন্তু তখনও একটি প্রশ্ন উঁকি-ঝুকি দিচ্ছে। মিষ্টির হাড়ি তো সাধারনত মাটির তৈরী হয়। ছেলেগুলো মাটির হাড়ি খেলো কিভাবে? স্যারের আদর-আপ্যায়ন খেয়ে বুকে কিছুটা সাহস সঞ্চয় হলে সে বলল,

- স্যার মিষ্টির হাড়িগুলো কি মাটির তৈরী ছিল?

- তা তো অবশ্যই, তা তো অবশ্যই। মাটির হাড়ি ছাড়া কি আর রসোগোল্লা মানায়?

- তাহলে স্যার ছেলেগুলো ঐ হাড়ি খেলো কি করে?

এই প্রশ্ন শুনে স্যার কিছুটা নাখোশ হয়েছেন মনে হলো। ভাঙা গলায় বললেন,

- হাড়ি খাবে কেনো গাধা! ছেলেরা খেয়েছিল মিষ্টি। হাড়ি আগের জায়গায়ই ছিল।

বিষয়টি সোহানের কাছে আবার জটিল মনে হয়। তাহলে তো শেষ পর্যন্ত হাড়ির সংখ্যা পাঁচই হবে। কিন্তু সাহস করে এ কথাটি সে জমির স্যারকে বলতে পারে না। আবার যদি বেত্র-বেদনা শুরু হয়ে যায়!

জমির স্যারের নিকট নতুন পদ্ধতিতে অংক শেখার পর থেকে অংকের আতংক সোহানের মনে আরো দৃঢ়ভাবে স্থান গেড়ে বসে। অংকের কথা শুনলেই এখনও তার সেদিনের কথা মনে পড়ে।

এখন অবশ্য সে ধরনের কোনো ভয়-ভীতির কারণ নেই। এই অংকটি কোনো জটিল অংক নয়। তাছাড়া এই বৃদ্ধ লোকটি তো আর জমির স্যার নয় যে ইচ্ছা করলেই তাকে বেত মারবে। তাই সাহস করে সোহান বলে,

- লোকের সংখ্যা কীভাবে অসংখ্য হলো সে তো সহজ হিসাব। যে তার খালাতো ভায়ের বন্ধুর প্রতিবেশীর সময় দেখা-শোনা, সেবা-শুশ্রূষা করার জন্য ট্রেনযোগে সফদারপুর যাত্রা করে। সে খালাতো-ফুফাতো বা চাচাতো ভাইদের এবং তাদের বন্ধু, প্রতেবেশী তাদের গোষ্ঠী-পালা সবার দেখা-শোনায় আত্মনিয়োগ করবে এটাই স্বাভাবিক। সেক্ষেত্রে তো মানুষের সংখ্যা অসংখ্য হয়ে যাবে। তাই নয় কি?

কথাটি বলে সোহান প্রখর দৃষ্টিতে বৃদ্ধের দিকে তাকিয়ে থাকে। এই মহাপন্ডিত দার্শনিক স্টাইলে শত-সহস্র প্রশ্নের সমাধান করে দিচ্ছেন অথচ এই সহজ হিসাবটি মাথায় ধরে না দেখে সে আসলেই অবাক হয়েছে।

বৃদ্ধ লোকটি কিন্তু সোহানের সুক্ষ্ম হিসাব নিকাশে মুগ্ধ হয়েছে বলে মনে হলো না। মুচকি হেসে বলল,

- অসুখ-বিসুখে দেখা শোনা করার কথা কে বলল? সারা লোকের অসুখ-বিসুখে দেখা শোনা করা কি আমার পক্ষে সম্ভব! কারো একটু জ্বর-জ্বালা হলেই আমি সেখানে ছুটে যাবো নাকি! আমি তো কেবল মৃতপ্রায় মানুষের সাক্ষাতে যায়। মৃতপ্রায় মানে প্রায় মরতে বসেছে এমন লোক। আর হয়তো কয়েক মিনিট বাঁচবে। আমি গিয়ে কেবল তার মরণটা দেখবো।

সোহান বুঝতে পারে এই অংকটির ক্ষেত্রেও একটি সুক্ষ্ম ভুল হয়ে গেছে। মৃতপ্রায় আর অসুস্থ মানুষকে সে একই রকম মনে করেছে কিন্তু আসলে তা নয়। এখন বোঝা যাচ্ছে অসুস্থ মানুষকে সেবা-শুশ্রূষা করে বাঁচিয়ে তোলা এই ব্যক্তির উদ্দেশ্য নয়। তিনি কেবল প্রায় মৃত এমন একজনের পাশে বসে তার মৃত্যু স্বচক্ষে অবলোকন করার জন্য এদিক-সেদিক ছুটা-ছুটি করেন। কিন্তু একজন মানুষের মৃত্যু দেখে এই ব্যক্তির কী লাভ!

- মানুষের মরণ দেখে আপনি আনন্দ পান? আপনি তো খুব নিষ্ঠুর।

- না-না। আনন্দ পাবো কেনো! আমি শিক্ষা গ্রহণ করি। আমি মৃত্যু নিয়ে গবেষণা করি। বিভিন্ন স্থান থেকে মৃত্যুর বার্তা সংগ্রহ করি। তাই সবাই আমাকে 'মৃত্যুদূত' বলে। একজন মানুষ মারা যাবার কিভাবে ছট-ফট করে, তার চেহারার রঙ কেমন হয়, হাসে নাকি কাঁদে, কোনো প্রশ্ন করলে উত্তর দিতে পারে কিনা এই সব আর কি।

- মৃত্যু নিয়ে গবেষণা! এ আবার কেমন কথা! মৃত্যু কি কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে তা নিয়ে গবেষণা করতে হবে?

- গুরুত্বপূর্ণ নয়? অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ, একশ বার গুরুত্বপূর্ণ। মৃত্যু একটি নতুন জীবনের সূচনা, মৃত্যু হলো, মুক্তি। মুমিন ব্যক্তি মৃত্যুর পর জান্নাতী হয় তা কি তোমার জানা নেই?

- দেখুন আমি এসব পুরো-পুরি বিশ্বাস করি না। আমাকে এসব বলে লাভ নেই।

- বিশ্বাস করো না? তার মানে তুমি একজন নাস্তিক?

সোহান সম্মতির স্বরে মাথা নাড়ে। সে পুরো-পুরি নাস্তিক না হলেও মোটা-মুটিভাবে তাকে নাস্তিকই বলা যায়। আল্লাহ-আখিরাত জান্নাত-জাহান্নাম এসব কিছু সে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করে তা নয় কিন্তু এসব নিয়ে তার যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। যে সন্দেহ করে সে তো আর ঠিক বিশ্বাসী নয় অতএব, তাকে নাস্তিকই বলা চলে। সোহানকে সম্মতি দিতে দেখে বৃদ্ধ লোকটি নিজের মুখটি তার মুখের খুব নিকটে নিয়ে আসে। বেশ কিছুক্ষণ ধরে সোহানের মুখটি গভীরভাবে পর্যবেক্ষন করে উপর থেকে নিচে মাথা ঝাকাতে ঝাকাতে বলে,

- আমি নিশ্চিত হলাম বাবা, আমি পুরো-পুরি নিশ্চিত হলাম।

- কি নিশ্চিত হলেন? আমার চেহারা দেকে আমি নাস্তিক কিনা সে বিষয়ে নিশ্চিত হলেন? আপনি চেহারা দেখেও নাস্তিক চিনতে পারেন দেখছি!

- না বাছা, তা নয়। জামসেদ মোল্লার কথা যে ঠিক সে ব্যাপারে নিশ্চিত হলাম।

- এই জামসেদ মোল্লাটা আবার কে? আমার সাথে তার কিসের সম্পর্ক?

- তোমার সাথে তার কোনো সম্পর্ক নেই বাছা। তিনি খুব দ্বীনদার মানুষ। কোনো নাস্তিকের সাথে তার সম্পর্ক থাকার কথা নয়। তিনি আমার উস্তাদ। আমাকে কুরআন পড়া শিখিয়েছেন। আমার বয়স তখন পাঁচ কি সাত হবে, বেশিও হতে পারে। এখন কি আর বয়সের হিসাব-নিকাশ করার সময় আছে? মসজিদের মকতবে জামসেদ মোল্লা আমাদের কুরআন পড়া শেখাতেন- প্রায় পঁচিশ ত্রিশ জন ছেলে-বুড়ো এক সাথে পড়তাম

- আলিফ, বে, তে, ছে- আলিফ, বে, তে, ছে....

বৃদ্ধ মানুষটি হঠাৎ তার শৈশবে ফিরে যায়। তার কল্পনায় ভেসে ওঠে মসজিদের মক্তব ঘরটি। এটাকে ঘর বলা হয়তো ভুল হবে। চারটি খুটির উপর খড়ের ছাউনি দেওয়া, চারিদিকে কোনো বেড়া বা প্রাচীর নেই। গ্রামের মানুষ এধরনের ঘরকে চালা বলে। সেই চালা ঘরেই চলতো জামসেদ মোল্লার আরবী প্রশিক্ষণ। সেখানে ভর্তি হওয়ার কোনো নিয়ম-কানুন ছিল না। ছিল না বয়সের বাধা। দু-তিন বছরের দুধের বাচ্চা থেকে শুরু করে বিশ কি ত্রিশ বছরের বিবাহিত পুরুষ পর্যন্ত মকতবে আরবী শিখতে আসতো। তারা একতানে সুর করে বলতো- আলিফ, বে, তে, ছে- আলিফ, বে, তে, ছে। মসলিসের এক প্রান্তে একটি চৌকি পেতে জামসেদ মোল্লা বসতেন। মুখে ধবধবে সাদা দাড়ি গাঁয়ে কাফনের মতো সাদা পোশাক। ফেরেশতার মতো তার চেহারা। তাকে দেখে বাচ্চারা খুব ভয় পেতো। তিনি যে তাদের মারধর করতেন তা নয়। কেবল বলতেন, কেউ দুষ্টুমি করলে কিন্তু তার মাথা চিবিয়ে খেয়ে নেবো! কথাটি বলেই এমনভাবে মুখ ভেংচি দিতেন যে তার সবগুলো দাঁত বের হয়ে পড়তো। পান খেয়ে লাল করা দাঁতগুলো দেখে বাচ্চারা ভাবতো সত্যি সত্যিই জামসেদ মোল্লা মানুষের মাথা চিবিয়ে খায়। তারা একেবারে চুপ হয়ে যেতো।

বৃদ্ধ মানুষটি একমনে তার শৈশবের স্মৃতি মন্থণ করে চলেছে। সোহান এক নজরে তাকিয়ে আছে তার দিকে। কেনো জানি এখন তার মনে হচ্ছে এই মানুষটি খুব একটা খারাপ মানুষ নয়। চেহারা পাগলাটে আর কথা-বার্তা রহস্যময় হলেও তার মনটি নিশ্চয় খুবই সরল প্রকৃতির।

নিজের শৈশবকে স্মরণ করে বৃদ্ধ লোকটি সুখ অনুভব করেছে বলে বোধ হয়। মুচকি হাসতে হাসতে বলে,

- জামসেদ মোল্লা আমাদের প্রায়ই বলতেন, ‘‘বাবারা শোনো, আল্লাহ পাঁক হাজারো কিসিমের মাখলুক পয়দা করেছেন। তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা আজব সৃষ্টি হলো নাস্তিকরা। তারা দেখতে হুবহু মানুষের মতো কিন্তু আসলে মানুষ নয়। তারা আল্লাহ-আখিরাত, জান্নাত-জাহান্নাম কিছুই বিশ্বাস করে না।’’ তখন হুজুরের কথা পুরো-পুরি বিশ্বাস করি নি। হুবহু মানুষের মতো কিন্তু মানুষ নয় এমন কোনো সৃষ্টি দুনিয়াতে থাকতে পারে! আজ তোমাকে দেখে বুঝলাম তিনি ঠিকই বলেছিলেন। তাই ভাল করে তোমাকে পর্যবেক্ষন করে নিশ্চিত হলাম। দেখলাম, তুমি নাস্তিক হওয়া সত্ত্বেও হুবহু মানুষের মতো।

কথাটি শুনে সোহানের চোখ-মুখ লাল হয়ে যায়। এধরনের অপমানজনক মন্তব্যের বিপরীতে কি বলা উচিৎ ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। একজন বয়োজ্যোষ্ঠ মানুষ একটা মন্তব্য করেছে সেটা নিয়ে ঘাটা-ঘাটি করা অনুচিৎ ভেবে সোহান আলোচনার মোড় ভিন্ন দিকে প্রবাহিত করার চেষ্টা করে।

- আপনার সফদার পুর আর কত দূর?

ট্রেনের জানালা দিয়ে বাইরের দিকটায় চোখ বুলিয়ে নিয়ে বৃদ্ধ বলে ওঠে-

- ভালো কথা মনে করেছো বাবা। এই তো পৌঁছে গেছি। আর বড়জোড় মিনিট পাঁচেকের ব্যাপার। যাওয়ার আগে আমার প্রশ্নটার উত্তর চাই। তুমি মৃত্যুকে বিশ্বাস করো কি না সেই প্রশ্নটার।

- মৃত্যুকে আবার কেউ অবিশ্বাস করে নাকি?

- করে বৈকি! বুদ্ধিমান মাত্রই মৃত্যুকে অবিশ্বাস করে। মৃত্যুকে যে বিশ্বাস করে সে একটা বোকা, অপদার্থ। এই যে দেখো, আমি মৃত্যুকে বিশ্বাস করি না।

- আপনি মৃত্যুকে বিশ্বাস করেন না! একটু আগেই আমাকে নাস্তিক বলে যাচ্ছেতাই গালিগালাজ করলেন আর এখন কিনা বলছেন আপনি মৃত্যুকে বিশ্বাস করেন না। আপনি তো দেখছি বড় নাস্তিক।

- কেনো? আমি নাস্তিক হতে যাবো কেনো?

- কত নাস্তিক আর কাফির মুশরিকের গল্প শুনেছি, তারা আল্লাহ-আখিরাতে অবিশ্বাস করতো কিন্তু মৃত্যুতে বিশ্বাস করে না এমন লোক তো কখনও দেখি নি। চোখের সামনে বাবা-মা, ভাই-বোন, পাড়া-প্রতিবেশী প্রতিনিয়ত মারা যাচ্ছে। এসব দেখেও যদি কেউ মৃত্যুকে অবিশ্বাস করে তবে সে বড় নাস্তিক হবে না!

- এসব দেখি বলেই তো মৃত্যুকে বিশ্বাস করি না বাবা। মৃত্যুর কি কোনো বিশ্বাস আছে। যে কোনো মুহূর্তে যে কারো নিকট হাজির হতে পারে। কারো মৃত্যু হয় আশি বছরে কারো হয় এক দিনে। কেউ সকালে, কেউ রাতে। এই আছে, এই নেই।

মৃত্যুকে কি বিশ্বাস করা যায়!

সোহান বুঝতে পারে আবার কোথাও সুক্ষ্ম একটা ভুল করছে সে। কোনো কথা না বলে মনোযোগ দিয়ে বৃদ্ধের কথা শুনতে থাকে।

- শোনো বাবা, মৃত্যুতে বিশ্বাস করা আর মৃত্যুকে বিশ্বাস করা এক জিনিস নয়। আমি মৃত্যুতে বিশ্বাস করি কিন্তু মৃত্যুকে বিশ্বাস করি না। মৃত্যুতে তো বিশ্বাস করতেই হবে কিন্তু মৃত্যুকে বিশ্বাস করা যাবে না। কত মানুষ মৃত্যুকে বিশ্বাস করে বসে রয়েছে। তারা মনে করে আমরা আশি বছর বা একশ বছর বাঁচবো। কেউ আবার হাজার বছর বাঁচার ইচ্ছা করে। এই ভেবে টাকা জমিয়ে পাহাড় গড়ে। কিন্তু মৃত্যু তাদের বিশ্বাস ভঙ্গ করে হঠাৎ হানা দেয়। সব কিছু শেষ হয়ে যায়। তাই বলি, কখনও মৃত্যুকে বিশ্বাস করো না। সদা-সর্বদা মৃত্যুর জন্য তৈরী হয়ে থাকো। যাতে করে মৃত্যুর পরের জীবনে কোনো দুঃখ কষ্ট ভোগ করতে না হয়।

বৃদ্ধের কথাগুলো সোহানের অন্তরে গেঁথে যাচ্ছিল। তিনি নিশ্চয় আরো কিছু বলতেন। কিন্তু হঠাৎ ট্রেনের হুইসেল বেজে ওঠে। ট্রেন সফদারপুর স্টেশনে পৌঁছে গেছে। বৃদ্ধ মানুষটি ট্রেন থেকে নামার জন্য তাড়াতাড়ি সীট ছেড়ে উঠে পড়ে-

- আমি তবে এখন যাই বাছাধন, সালাম।

সোহান মন্ত্রমুগ্ধের মতো হয়ে যায়। অস্ফুট স্বরে বলে

- সালাম।

দুই.

বাড়ি ফিরতে বেশ রাত হয়ে যায়। সোহানের মা জেগেই ছিলেন। দরজায় টোকা দিতেই তিনি দরজা খুলে দিলেন।

- এতো রাত হলো কেনো রে? রাস্তায় কোনো সমস্যা হয় নি তো?

- না মা। সমস্যা হবে কেনো? আমি কি আর এখনও ছোট খোকা আছি!

- খোকা না হলেও বোকা তো বটে। পথ ভুলে কোন কূলে গিয়ে ওঠো তার কি ঠিক আছে!

সোহানের মা একেবারে ভুল বলেন নি। পথ ভুলে হারিয়ে যাওয়ার রেকর্ড তার আছে। একবার এক শিক্ষা সফরে গিয়ে তার এমন শিক্ষা হয়েছিল যা ভুলার নয়। তখন সে মণিরহাটা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ে। শিক্ষা সফরে যেয়ে

বিভিন্ন শিক্ষণীয় জিনিস দেখতে-দেখতে অনেকটা সময় পার হয়ে যায়। সোহান খুব বেশি মিশুক নয়, তাছাড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সবেমাত্র ভর্তি হয়েছে। এখনও কারো সাথে সদ্ভাব গড়ে তুলতে পারে নি। বোকার মতো এদিক-সেদিক ঘুরাঘুরি করতে করতে কখন যে, একা পড়ে গিয়েছিল সে বুঝতে পারেনি। বিকালে যখন দেখলো একটা একটা করে বাসগুলো বাড়ির দিকে রওয়ানা দিচ্ছে তখন তার দুশ্চিন্তা শুরু হয়। যে জায়গাটায় অনেকগুলো বাস দাড় করিয়ে রাখা হয়েছিল সেখানে গিয়ে নিজেদের বাস খুঁজে বের করার চেষ্টা করে সে। বেশ-কিছুক্ষণ খুঁজা-খুঁজি করেও সে বাস শনাক্ত করতে পারে না। এক পাল ছাগল যেমন দেখতে এক রকম হয়, মুখ দেখে চেনার উপায় থাকে না বাসগুলো সোহানের কাছে তেমনই মনে হয়। অনেক চেষ্টা করে তার কেবল মনে পড়ে তাদের বাসের ড্রাইভার ছিল টাক মাথা ওয়ালা। সে এবার টেকো মাথার লোক খুঁজে বের করার চেষ্টা করে। এ পদ্ধতিতে খুব সহজেই সফলতা পাওয়া গেল। সামন্য খুঁজা-খুঁজি করতেই একজন টেকো লোক তার নজরে পড়ে যায়। একটা বাসের ভিতরে ড্রাইভারের সীটে বসে ঘুমাচ্ছিল লোকটি। এই টেকো লোকটিকে দেখে সোহান নিশ্চিত হয়ে যায় এই বাসটিই তাদের বাস। সোহান বাসের দরজার নিকট ঠাই দাড়িয়ে অপেক্ষা করতে থাকে। বাসের দরজা খোলাই ছিলতবু ভিতরে ঢোকার সাহস হচ্ছিল না সোহানের। তার ভয় হচ্ছিল যদি ভিতরে ঢুকলেই টেকো লোকটা দাঁত-মুখ খিচিয়ে বকা-ঝোকা করে! সোহান দরজার কাছে অপেক্ষা করছিল লোকটার ঘুম ভাঙলে তার অনুমতি নিয়ে বাসে ওঠার জন্য। কিন্তু লোকটার ঘুম যেনো আর ভাঙে না। অনেক্ষণ অপেক্ষা করার পর লোকটি একটু নড়ে ওঠে। সোহানের দিকে মিট-মিট করে একবার তাকিয়ে আবার ঘুমিয়ে পড়ার চেষ্টা করে। তার আগেই সোহান তাড়াহুড়া করে বলে,

- এই বাস কি আমাদের বাস?

প্রশ্ন শুনে লোকটি অনেক কষ্টে চোখ মেলে তাকায়। কিছুটা বিরক্তি প্রকাশ করে বলে,

- এটা পিকনিকের গাড়ি।

- আমি বাড়ি যাবো।

- বাড়ি যাবো বললেই কি আর বাড়ি যাওয়া যবে? ভিতরে উঠে বসো। আর সব ছাত্ররা আসুক।

এর চেয়ে বেশি কিছু বলার মতো ধৈর্য্য লোকটির হলো না। চোখ বুজে আবার ঘুমিয়ে পড়ল।

সোহান আস্তে আস্তে বাসের ভিতরে উঠে যায়। একেবারে পিছনের দিকে একটা সীটে বসে আর সব ছাত্ররা কখন আসে সেই অপেক্ষায় থাকে।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না। কিছুক্ষণ পরই মোটা গলার আওয়াজ শোনা গেলো,

- ছেলেরা সবাই বাসে উঠে পড়ো। তাড়াতাড়ি করো।

লোকটার কথা শেষ হওয়ার সাথে সাথেই পঙ্গপালের মতো হুড়-হুড় করে ছেলেরা বাসের মধ্যে উঠতে থাকে। তাদের কারো কারো বয়স সোহানের মতো কেউ আবার তার চেয়ে দু-তিন বছরের বড়। সোহান তাদের কাউকে চিনতে পারে না। এর মধ্যে সোহান অনুভব করে কেউ একজন তার হাত ধরে টানা-হ্যাঁচড়া করছে।

- এই যে, আমার সীটে বসেছো কেনো?

সোহান তাকিয়ে দেখে, গরুর মতো মোটা একটা ভোতকা ছেলে চোখ কটমট করে তার দিকে তাকিয়ে আছে।

অগত্যা সীট ছেড়ে উঠে দাড়ায় সে।

সব ছাত্র আর শিক্ষকরা উঠে পড়লে বাস চালু হয়ে যায়। সোহান ড্রাইভারের সীটের দিকে তাকিয়ে থাকে। পিছন থেকে লোকটির মাথা পূর্ণিমার চাঁদের মতো গোল মনে হয়। সোহানের অন্তরে সাহস সঞ্চয় হয়। তার মনে হয়, সব কিছু ঠিক-ঠাক আছে।

বিকাল গড়িয়ে সন্ধ্যা হয়ে যায়তারপর রাত, গভীর রাত। দাড়িয়ে থাকতে থাকতে পা ব্যাথা হয়ে যায় সোহানের। হঠাৎ বাস থেমে যায়। ছেলেরা তড়িঘড়ি করে নিচে নামতে থাকে। সোহান জানালা দিয়ে উঁকি দেয়। চারিদিকে অন্ধকার তেমন কিছু দেখা যায় না। এদিক-সেদিক চোখ বুলাতেই তার নজরে পড়ে বড় একটা দরজা। সোহানদের স্কুলেও এমন একটা দরজা আছে। তার উপরে লেখা আছে“মনিরহাটা মাধ্যমিক বিদ্যালয়”। সোহান ভাল করে দেখার চেষ্টা করে এই দরজাটির উপর তেমন কিছু লেখা আছে কি না। বাসের লাইটগুলো জ্বলছিল। সেই আলোতে আবছা আবছা দেখা যাচ্ছিল লেখাটা। “মাধবখালি মাধ্যমিক বিদ্যালয়”। সোহানের বুকের মধ্যে ধক করে একটা শব্দ হয়। এই প্রথম সে বিপদ বুঝতে পারে।

সব ছাত্ররা নেমে যায়। বাস পুরো খালী হয়ে যায়। কেবল টাক মাথার লোকটি ড্রাইভারের সীটে বসে ছিল আর তার পাশের লম্বা সীটটিতে বসে ছিল দুজন লোক। সব ছাত্ররা নেমে গেলেও সোহান নামে না। সে একটা সীটের উপর বসে পড়ে। টেকো লোকটিকে ছেড়ে কোথাও যেতে তার মন সাই দিচ্ছে না। সেই যেনো তার একমাত্র অবলম্বন। বাস আবার চলতে শুরু করে। সোহান অপেক্ষা করতে থাকে। ঠিক কিসের জন্য অপেক্ষা করছে তা সে বুঝতে পারে না। শুধু এতটুকু জানে তাকে বাড়ি যেতে হবে। তার মনে হয় এই টেকো লোকটি তাকে বাড়ি নিয়ে যাবে। সোহান অনুভব করে ভয় আর অজানা আতংকে তার ভিতরটা কুকড়ে উঠেছে। সে ফুপিয়ে

কাঁদতে থাকে। কিছুক্ষণ পর বাসটি একটা প্রশস্ত স্থানে এসে থেমে গেল। সোহান জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখে এখানে আরো দু'চারটি বাস রয়েছে। চারিদকে ঘনো কালো রাত। কোথাও টু-শব্দ হচ্ছে না। কেবল সোহানদের বাসটি শো-শো শব্দ করছিল আর থর-থর করে কাপছিল। কিছুক্ষণ পর তাও বন্ধ হয়ে যায়। টেকো লোকটি সীট থেকে উঠে মুখে হাত দিয়ে একটা হাই তোলে তারপর বাস থেকে নামার জন্য রওয়ানা হয়। লোকটি নেমে যাওয়া দেখে সোহানের সব আশা হতাশায় পরিনত হয়।ফুপিয়ে কাঁদার বদলে সে এবার সজোরে কেঁদে ওঠে। তার কাঁদার শব্দ শুনে লোকটি পিছনে ফিরে তাকায়।

- ওখানে কে? কে ওখানে?

সোহান কোনো উত্তর দেয় না। সে আরো জোরে কেঁদে ওঠে।

- এই মতি, বাসের মধ্যে কে কাঁদছে দেখতো।

বাসের মধ্যে এখন যে উঠে আসলো তার নাম মতিই হওয়ার কথা। এদিক-সেদিক অনুসন্ধান করে সে সোহানকে খুঁজে বের করলো।

- এই ছেল তুমি এখানে কেনো? স্কুলে নামতে ভুলে গেছো? ঘুমিয়ে পড়েছিলে! এসো নিচে নেমে এসো।

সোহান ভাল ছেলের মতো লোকটির পিছু পিছু নেমে আসে।

- ওস্তাদ! এই ছেলেটা স্কুলে নামতে ভুলে গেছে। বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছিল।

মতির কথা শুনে টেকো লোকটি ভীষণ বিরক্ত হয়ে সোহানের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে। পাশ থেকে একজন বলে,

- জাকের ভাই, ছেলেটাকে বকা-ঝকা করে লাভ নেই। তার আর কি দোষ!

জাকের ড্রাইভার সোহানের দিকে হাত ইশারা করে বলে,

- এদিকে আয়।

সোহানের মনে হয় লোকটা খুব নিষ্ঠুর প্রকৃতির। তার ভয় হয় লোকটা হয়তো তার দু-গালে দুটো চড় কষে দেবে। সে ভয়ে ভয়ে টেকো লোকটির দিকে এগিয়ে যায়। লোকটা অবশ্য তেমন কিছু করলো না। সোহানের কাঁধের উপর হাত রেখে বিরক্তির সাথে কিছুটা মমতা মিশ্রিত কণ্ঠে বলল,

- ঘুমানোর জায়গা পাও না!

সোহানের কোনো কথা বলার সাহস হয় না। কেবল ফুপিয়ে কাঁদতে থাকে।

- এই মতি, একে আজ রাতটুকু কোথাও রেখে কাল মাধবখালী স্কুলে পৌঁছে দিস।

আমি বাড়ি যাচ্ছি। ঘুমে আমার চোখ বুজে আসছে।

লোকটার চলে যাওয়ার কথা শুনে সোহান আবার সজোরে কেঁদে ওঠে।

- কি হলো আবার কাঁদছিস কেনো?

- আমি স্কুলে যাবো না, বাড়ি যাবো।

- স্কুলে গেলেই ওরা তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দেবে। আমরা কি আর তোমার বাড়ি চিনি!

- আমি এখানে থাকবো না, আপনার সাথে যাবো।

কথাটি শুনে লোকটি ঠাই দাড়িয়ে যায়। তার মনে পড়ে মিঠুনের কথা। প্রায় দেড়-দু বছর আগের কথা। শশুর বাড়িতে ছেলে আর বউকে রেখে বাড়ি আসার সময় মিঠুন তাকে জড়িয়ে ধরে বলেছিল-

- আব্বু আমি তোমার সাথে যাবো।

- না আব্বু আমার তো অনেক কাজ তাই আগে চলে যাচ্ছি। তুমি দু'এক দিন নানা বাড়ি বেড়িয়ে কাল-পরশু আম্মুর সাথে চলে আসবে।

দু'দিন পর ঘটে সেই মর্মান্তিক ঘটনা। বাবার বাড়ি থেকে ফেরার পথে সড়ক দূর্ঘটনায় তার বৌ-বাচ্চা নিহত হয়। ভেঙে যায় তার সুখের সংসার। তারপর এখনও নতুন করে সংসার গড়ে নি সে। ভয় হয়, যদি আবার অঘটন ঘটে।

সে বেদনা এখনও তার অন্তরে বিঁধে আছে। মনে হয় যেনো গতকাল ঘটেছে। একটু নিসঙ্গ হলেই সে সেদিনের কথা ভাবে। ভাবে, কত সহজে সুখের সংসার চোখের পলকে ভেঙে যেতে পারে! নিজের অজান্তেই সে বলে ওঠে, হে আল্লাহ তুমিই সব কিছুর মালিক যাকে খুশি অফুরন্ত সুখ দাও আবার যখন খুশি ছিনিয়ে নাও। মাঝে মাঝে মনে হয় সেদিন মিঠুনের কথা মতো তাকে নিয়ে আসলে হয়তো দুর্ঘটনাটা ঘটতো না। হয়তো মৃত্যুর ছোবল থেকে তাকে বাঁচানো যেতো। কিন্তু কে জানে হয়তো মৃত্যু তার বাড়িতেও হাজির হতো। তার বাহুর বন্ধন ছিন্ন করে আদরের সন্তানকে ছিনিয়ে নিয়ে যেতো। মৃত্যুর কি আর বিশ্বাস আছে!

জাকের ড্রাইভার উদাসীন হয়ে যায়। বেশ কিছুক্ষণ নিরব থেকে বলে,

- আমার সাথে যাবি? কেনো?

সোহানের মনে হয় লোকটির গলার স্বর পাল্টে গেছে, কণ্ঠ ভেঙে গেছে। সে কোনো কথা বলে না। কেবল লোকটার দিকে অপলক তাকিয়ে থাকে। লাইটপোষ্টের আলোতে স্পষ্ট দেখা যায় লোকটির দু চোখ পানিতে টলমল করছে।

- তবে আই আমার সাথে।

বলে সোহানের হাত ধরে টানতে টানতে লোকটি দ্রুত বাড়ির দিকে রওয়ানা হয়।

বাড়ি বলতে দুটো ঘর, সামনে ছোট একটি উঠান আর উঠানের এক কোণে একটি রান্নাঘর। ঘরের জিনিসপত্র সব এলোমেলো। চেয়ারের উপর দুটো জামা পড়ে আছে খাটের উপর আরো দুটো, এদিক-সেদিক ছড়ানো ছিটানো রয়েছে দু-চারটি বই।

- তুই হাত-মুখ ধুয়ে নে। আমি রান্না করবো।

এই লোকটি রান্না করবে শুনে সোহান ভীষণ অবাক হয়। পুরুষ মানুষ আবার রান্না করে নাকি!

- রান্না বলতে একটা ডিম ভাজা আর আলু ভর্তা। দুপরে রান্না করা ঠান্ডা ভাত রয়েছে তার মধ্যে আছে সিদ্ধ আলু। এখন একটা ডিম ভাজলেই কর্ম কাবার।

বলতে বলতে লোকটি রান্না ঘরের দিকে চলে যায়।

কিছুক্ষণ পর দু'জন এক সাথে খেতে বসে। সোহান খুব বেশি খেতে পারে না। এমনিতে ডিম ভাজার সাথে আলু ভর্তা সোহান যথেষ্ট পছন্দ করে কিন্তু এখন খেতে ভাল লাগছে না। ভীন দেশে হারিয়ে গিয়ে মন দিয়ে খাওয়া খুব সহজ কথা নয়।

- কিরে খাচ্ছিস না কেনো? রান্না ভালো হয় নি বুঝি!

- আমার মন ভাল লাগছে না।

- তবে আই আমি তোকে খাইয়ে দিই।

লোকটির ভীষণ শক্ত আর মোটা-মোটা আঙ্গুল গুলো সোহানের ছোট মুখে সহজে জায়গা পায় না। সোহান একটু বড় করে হা করে আর লোকটি একেক লোকমা ভাত তার মুখে পুরে দেয়। এভাবে খেতে সোহানের ভালোই লাগে। সে বুঝতে পারে তার আর কোনো চিন্তা নেই। এই টেকো লোকটা তাকে ঠিকই সাহায্য করবে।

- তোর নাম কিরে?

- সোহান।

- মোঃ সোহান আলী?

- না। মোঃ শাহনুর শাহা সোহান

- বাহ! বাহ! খুব সুন্দর নাম। এ নাম তুই কোথায় পেয়েছিস?

সোহান এই প্রশ্নের কোনো উত্তর দিতে পারে না। নাম কি আর গাছের আম যে ঝড়ের দিনে কুড়িয়ে পাওয়া যাবে!

- তোর বাবা রেখেছে বুঝি?

- উহু, আমার বাবা নেই, মরে গেছে।

সোহান খুব সহজভাবে কথাটি বলে, কিন্তু ড্রাইভার সাহেব কথাটি সহজভাবে নিতে পারেন না।

- মরে গেছে! হায়, হায়! এ কি কথা।

কথাটি বলতে বলতে সোহানকে জড়িয়ে ধরে হু হু করে কেঁদে ওঠে লোকটি। সোহান ব্যাপার কি বুঝতে পারে না। তার বাবা মারা গেছে শুনে এই লোক কাঁদবে কেনো?

- মৃত্যু খুব কঠিন জিনিস রে। ছেলেকে বাবা থেকে আলাদা করে দেয়, বাবাকে ছেলের থেকে। স্বামী-স্ত্রী, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সবাইকে নিসঙ্গ করে দেয়।

মৃত্যু কেনো কঠিন সোহান ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। একজন লোক না থাকলে কি হয়? এই যে তার বাবা নেই তাতে কি তার কোনো অসুবিধা হচ্ছে? সময় মত খাচ্ছে, ঘুমাচ্ছে, খেলা করছে আর কি চাই! নাওয়া-খাওয়া খেলা-ধুলা ছাড়াও যে জীবনের অন্য কোনো অর্থ আছে তা সে এখনও জানে না। তাই কারো মৃত্যুর খবর শুনে আরেকজন কাঁদলে সে খুব অবাক হয়।

সকাল বেলা ড্রাইভার সাহেব সোহানকে মাধবখালী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পৌঁছে দেওয়ার জন্য রওয়ানা হন। স্কুলে পৌঁছিয়ে একজন দপ্তরীর সাথে আলোচনা করলে তিনি দু'জনকে প্রধান শিক্ষকের অফিসে অপেক্ষা করার পরামর্শ দেন। তাদের বলা হয় কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রধান শিক্ষক হাজির হয়ে যাবেন। কিছু শব্দটার মধ্যেই আসলে সমস্যা আছে বলে মনে হলো। কিছু বলতে ঠিক কত বোঝায় সেটা ডিকশনারিতে লেখা নেইবলেই হয়তো বেশ কিছুক্ষণ অতিবাহিত হওয়ার পরও প্রধান শিক্ষকের দেখা মিলল না। নতুন জায়গায় এসে বাচ্চারা খুব একটা ছট-ফট করে না। সেকারণেই হয়তো সোহান এই দীর্ঘ প্রতীক্ষায় অস্থির হয় না। কিন্তু জাকের ড্রাইভার কাজের মানুষ। তার প্রতিটি মিনিট মূল্যবান। এভাবে অকারণে তার সময় কিল হতে দেখে তার শরীর পিল-পিল করে জ্বলতে শুরু করে। মাঝে মাঝে চেয়ারে কিল মেরে বিরক্তি প্রকাশ করতে থাকে। এর মধ্যে সেই দপ্তরীকে অফিসের পাশ দিয়ে যেতে দেখা যায়। দু'জনকে ঠাই বসে থাকতে দেখে লোকটি সৌজন্যতা করে বলে,

- আহা কী কাণ্ড! আপনার এখনও বসে রয়েছেন? আর একটু অপেক্ষা করুন হেড মাষ্টার সাহেব এখুনি চলে আসবেন।

একবার কিছুক্ষণের কথা বলে কয়েক ঘন্টা কেটে গেছে তাই এখুনি চলে আসার কথা

শুনে জাকেরের মাথা গরম হয়ে যায়। মনে হয় খুনো-খুনি বাধিয়ে ফেলবে।

- হেড মাষ্টারের কি দরকার? আপনারা ছেলেটাকে বুঝে নিলেই তো আমি চলে যেতে পারি।

- কি সর্বনাশ! আমি এসব করতে পারবো না। বাচ্চা-কাচ্চার কেস, আচ্ছা ঝুট-ঝামেলার ব্যাপার। একবার জড়িয়ে পড়লে জীবন শেষ। আমরা ভাই তিন পয়সার কর্মচারী .....

তার কথা শেষ হওয়ার আগেই হেড মাষ্টার হাজির হন। দপ্তরীটি তাড়াহুড়া করে তাকে সালাম দিয়ে বলে,

- স্যার এই লোকটি এই ছেলেটিকে আপনার কাছে নিয়ে এসেছে।

হেড মাস্টার, একবার জাকিেরর দিকে আর একবার সোহানের দিকে দৃষ্টি ফেলে ব্যাপার অনুমান করার চেষ্টা করেন। তার মনে হয় এই লোকটি তার ছেলেকে স্কুলে ভর্তি করার জন্য নিয়ে এসেছে। নিজের জন্য সংরক্ষিত চেয়ারটিতে বসতে বসতে তিনি বলেন,

- আপনার ছেেল বুঝি? বেশ সুন্দর তো!

- না-না স্যার এটা আপনাদেরই ছেলে।

- আমাদের ছেলে?

- জী হ্যাঁ স্যার। গতকাল শিক্ষা সফর থেকে ফিরে বাস থেকে নামতে ভুলে গিয়েছিল। বোধ হয় ঘুমাচ্ছিল।

- তাই নাকি? এ দেখি জটিল কেস! কিন্তু একে তো চিনতে পারছি না।

হেড স্যারের কথা শুনে জাকির ড্রাইভার সোহানের দিকে তাকিয়ে বলে,

- তোমার পরিচয় দাও।

সোহান ইতস্তত করে বলে,

- আমার নাম সোহান, মোঃ শাহনুর শাহা সোহান।

হেড স্যার একটু বিরক্ত হয়ে বলেন,

- তুমি কি দেশের প্রধানমন্ত্রী যে, নাম বললেই আমি তোমাকে চিনে ফেলবো?

সোহান নিরব থাকে। সে যে দেশের প্রধানমন্ত্রী নয় তা সে জানে কিন্তু নাম ছাড়া আর কি বললে স্যার তাকে চিনতে পারবেন সেটাও বুঝতে পারে না।

পাশ থেকে দপ্তরীটি বলে,

- তুমি কোন ক্লাসের ছাত্র, রোল নং কত?

বেশ একটা কাজের প্রশ্ন হয়েছে এমন ভাব দেখিয়ে প্রধান শিক্ষক জোরে জোরে মাথা নাড়তে থাকেন।

- আমার রোল নং আঠার, ষষ্ঠ শ্রেণী।

পাশেই রাখা হাজিরা খাতাগুলোর একটি নিয়ে দপ্তরীটি পর্যবেক্ষণ করতে শুরু করে।

- না স্যার, ষষ্ঠ শ্রেণীর আঠার নং রোল তো সোহান নয়, সোহাগ।

যেনো সমাধান হয়ে গেছে এমন ভাব করে প্রধান শিক্ষক বলেন,

- ঐ হলো, সোহাগ আর সোহান। একই ব্যাপার। ছেলেটি হয়তো নাম বলতে কিছুটা ভুল করছে।

কথাটি শুনে সোহানের খুব রাগ হয়। আর যাই হোক নিজের নাম ভুলে যাওয়ার মতো বোকা সে নয়। সে বুঝতে পারে এই গোলমালটা কেনো হচ্ছে। সে তো আর এই স্কুলের ছাত্র নয়। কিন্তু ড্রাইভার সাহেব বলেছেন স্কুলের লোকেরা তাকে বাড়ি পৌঁছে দিতে পারবে তাই সে চুপ থাকে কিছুই বলে না। অন্যরাও নিরব থাকে। শুধু দপ্তরীটি বলে,

- কিন্তু স্যার হাজিরা খাতায় তো দেখছি আঠার নং রোল আজ স্কুলে হাজির রয়েছে। সোহাগ যদি এই ছেলেটিই হবে তাহলে স্কুলে অনুপস্থিত থেকে হাজিরা খাতায় হাজিরা দিলো কিভাবে?

- এ তো খুব সহজ ব্যাপার। এখনকার ছেলেরা সব ইঁচড়ে পাকা। এদের মধ্যে কোয়ালিশন আছে। যাকে বলে, মহাজোট। একজন অনুপস্থিত থাকলে অন্য আর একজন হাজিরা দিয়ে দেয়।

এ বিষয়টি অবশ্য অস্বীকার করার মতো নয়। এর স্বপক্ষে যথেষ্ট সাক্ষ্য-প্রমাণ রয়েছে। দপ্তরীটি তাই মাথা নাড়তে নাড়তে বলে,

- তাহলে স্যার আমি ষষ্ঠ শ্রেণীতে গিয়ে দেখি সোহাগ নামের কেউ আসলেই হাজির আছে কিনা।

কথাটি শেষ করে কারো অনুমতির অপেক্ষা না করেই দপ্তরীটি অফিস থেকে বের হয়ে যায়। এর মধ্যে ঘন্টা বেজে ওঠে। দ্বিতীয় পিরিয়ড শেষ হলো মনে হয়। বিভিন্ন দিক থেকে কয়েকজন শিক্ষক অফিসে প্রবেশ করেন। তাদের কেউ কেউ পত্রিকা পাঠে মনোনিবেশ করেন। কেউ আবার আগন্তুক দু'জনের দিকে তাকিয়ে ঘটনা

অনুমান করার চেষ্টা করেন। হেড স্যার অবশ্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে ঘটনা বর্ণনা করা শুরু কের দেন।

- আপনারা কি গতকাল শিক্ষা সফরে কোনো ছাত্রকে ফেলে এসেছেন?

কেউ কোনো উত্তর দেওয়ার আগেই দপ্তরীটি অফিসে হাজির হয়। তার পিছু পিছু অফিসে প্রবেশ করে সোহানের বয়সের একজন ছাত্র।

- স্যার এই হলো সোহাগ। এবার দেখুন এ দুজন একই ব্যক্তি কিনা।

কথাটি বলে দপ্তরীটি সোহান ও সোহগ দুজনের দিকে হাত দিয়ে ইশারা করে।

কথা শুনে সোহাগ নামের ছেলেটি বিচলিত হয়ে পড়ে। নিজের নাম-পরিচয় বেদখল হওয়ার আশঙ্কায় ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে বলে,

- না স্যার আমি আর এ এক নয়, আলাদা। এই যে, দেখুন আমার হাটুর কাছে কাঁটার দাগ আছে।

বলতে বলতে নিজের হাটুর কাঁটা দাগটি সবাইকে দেখানোর জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে সে। তার কর্ম-কাণ্ড দেখে হো হো করে হেসে ওঠে উপস্থিত সবাই। জাকির ড্রাইভারের দিকে তাকিয়ে হেড স্যার বলেন,

- নিজ চোখেই তো দেখলে, এ ছেলে আমাদের স্কুলের নয়। তুমি একে যেখান থেকে ধরে এনেছো সেখানে ছেড়ে আসলেই ভাল হবে।

হেড স্যারের কথা শুনে ভীষণ হতাশ হয় জাকির। ছেলেটিকে নিয়ে এখান থেকে চলে যাওয়ার আগে চারপাশটা একবার চোখ বুলিয়ে নেয়। এটাই তার শেষ চেষ্টা। হেড স্যারের ডান হাতের আলমারীটির পাশের চেয়ারগুলোকে দু'তিন জন লোক বসে রয়েছে। তাদের মধ্যে একজন মাথা ঝুকিয়ে পেপার পড়ছে। তার পুরো শরীর পেপারে ঢেকে গেছে কেবল মাথার কালো চুলগুলো দেখা যাচ্ছে। মনে হচ্ছে দেহ মন সব কিছু সে পেপারের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছে। অফিসের এতক্ষণ যা কিছু হয়েছে মনে হয় তার নজরে পড়ে নি। সেই লোকটিই হঠাৎ পেপার থেকে মাথা তুলে ভীষণ উৎসাহ নিয়ে বলে ওঠে,

- তোমার নাম যেনো কি বললে?

- সোহান।

- মোঃ শাহানুর শাহা সোহান তাই না!

সোহান মাথা নাড়ে। সবাই খুব অবাক হয়ে লোকটির দিকে তাকায়। এই লোকটি কি ছেলেটিকে চিনতে পেরেছে! সোহান কিন্তু অবাক হয় না। তার মনে পড়ে, সে এর

আগে একবার নিজের নামটি সম্পূর্ণ বলেছে। অতএব, অবাক হওয়ার কিছু নেই। কিন্তু পরে যা ঘটলো তাতে অবাক হতেই হলো।

- তোমার ডান হাতের কনুই এ একটা কাটার দাগ আছে?

সোহান নিজের কনুই নিজেই দেখার চেষ্টা করে। দাগ একটা আছে তা মনে আছে কিন্তু ডান হতে কি বাম হাতে সে বিষয়ে সে নিশ্চিত নয়। ততক্ষণে দপ্তরীটি সোহানের কাছে এসে পর্যবেক্ষণ শুরু করে দিয়েছে। সোহানের ডান কনুই উচু করে দেখে নিয়ে অনেকটা চিৎকার করে বলে,

- আছে স্যার আছে! এই যে দেখুন বলে সোহানকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে সবাইকে দেখাতে থাকে।

বেশ বাহাদুরী হচ্ছে এমন ভাব দেখিয়ে লোকটি আবার বলে,

- বাম কানের পিছনে একটা তিল?

হেড স্যার আর তর সইতে পারেন না। লোকটির দিকে তাকিয়ে বলেন,

- এই যে কাদের কি হচ্ছে এসব? জাদু বিদ্যার চর্চা করছো নাকি!

- না স্যার, কি যে বলেন! এই যে, দেখুন।

বলে পেপারটি হেড স্যারের হাতে তুলে দেয় কাদের স্যার। হেড স্যার পেপারটি হাতে নিয়ে পড়তে শুরু করে,

- "একটি নিখোঁজ সংবাদ" গতকাল শিক্ষাসফর থেকে মণিরহাটা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ষষ্ঠ শ্রেণীর একটি ছাত্র হারিয়ে গেছে। তার শরীরের রঙ শ্যামলা, নাম ......

হেড স্যার পত্রিকা পড়তে পড়তে বারবার সোহানের দিকে তাকায় যেনো মিলিয়ে দেখছেন সব কিছু ঠিক-ঠাকা আছে কিনা। সংবাদটি পড়া শেষ করে টেবিলের উপর পেপারটি রাখতে রাখতে বলেন,

- তুমি তাহলে মণিরহাটা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র?

- জী।

- এতক্ষণ বলোনি কেনো? তাহলে কি আর এত প্যাচাল করতে হতো!

সোহান নিরব থাকে। মনে মনে ভাবে, সে কোথায় পড়ে সেটা তো আর এতক্ষণ কেউ জানতে চাইনি তাহলে বলবে কেনো?

এবার জাকির ড্রাইভারের দিকে তাকিয়ে হেড স্যার বলেন,

- ব্যাপার তো বুঝলে। ছেলেটাকে এবার এই ঠিকানায় পাঠিয়ে দাও। এটা তোমার মানবিক দায়িত্ব।

- জী স্যার। আমি তাই করবো। ছেলেটা যখন আমার হাতেই পড়েছে আমিই তাকে পৌঁছে দেবো। আমি এখনই ওকে নিয়ে রওয়ানা হবো। আমি তবে আসি স্যার।

কথাটি বলে জাকির সোহানের হাত ধরে অফিস থেকে বের হয়ে পড়ে। সে এবার সোহানকে নিয়ে মণিরহাটা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের দিকে রওয়ানা হয়। সোহানকে নিয়ে সে একটা ট্রেনে চেপে বসে। সোহানের মনে আছে, এটাই তার প্রথম ট্রেন ভ্রমণ। সোহানের এখনও মনে পড়ে, সারাটা রাস্তা লোকটা সোহানকে কত আদর করেছিল! আর কত কিছু যে খাইয়েছিল! বাদাম ভাজা, ঝাল-মুড়ি, শশা আরো কত কিছু! একবার ট্রেন থেকে নেমে পাশেই একটা হোটেলে গেলো রসগোল্লা কেনার জন্য। সোহানের তখন কি ভয় করছিল! তার মনে হচ্ছিল উনি আসার আগেই বোধ হয় ট্রেন ছেড়ে দেবে। এভাবে দীর্ঘ সময় পার হওয়ার পর শেষ পর্যন্ত ট্রেন মতিচুর স্টেশনে পৌঁছে যায়। সেখান থেকে একটা রিকশা নিয়ে মণিরহাটা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পৌঁছে যায় তারা। সোহানকে দেখার সাথে সাথে তার চারিদিকে স্কুলের সব ছাত্ররা ঘিরে ধরে। কেউ কেউ কৌতুক করে বলে,

- এই বোকা হাদা ছিলি কোথায়?

ইতোমধ্যে খবর পেয়ে ছুটে আসেন শিক্ষকরাও। সোহানকে দেখে তাদের কেউ কেউ মুচকি হাসে কেউ আবার চোখ কটমট করে তাকায়। বোঝায় যাচ্ছে তারা সাবাই তার জন্য চিন্তিত ছিল। প্রধান শিক্ষক নিজেই অফিস থেকে বের হয়ে আসেন। জাকিরের দিকে চেয়ে বলেন,

- আপনি আমাদের বাঁচালেন। কি যে কঠিন দুঃচিন্তার মধ্যে ছিলাম আমরা! ছেলেটার মা তো প্রায় খুন হয়ে যাওয়ার জোগাড়। বাপ মরা এতীম ছেলে!

জাকিরের অন্তরটা শুকিয়ে যায়। নিজের ছেলেকে হারানোর পর হারিয়ে যাওয়া ছেলেটা পেয়ে তার অন্তর সত্যিই প্রশান্তি পেয়েছিল কিন্তু তাকে আবার হারাতে হচ্ছে দেখে তার চোখে পানি চলে আসে।

- সে কি! কাঁদছেন কেনো আপনি? এই শুভক্ষণে কাঁদার কি আছে?

ইতোমধ্যে সোহানের মা চলে আসে স্কুলে। সোহানকে জড়িয়ে ধরে ওর মা ফুপিয়ে ওঠে। ওড়না মোড়ানো মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে সোহান দেখে তার মা কাঁদছেন। সোহান ফিরে আসার পর স্কুলের সবাই হাসছে কেবল ড্রাইভার সাহেব আর সোহানের মা এই দুজন কাঁদছে। এই হাসি-কান্নার কোনো অর্থ সোহান বুঝতে পারে না। একটা ছোট ছেলে হারিয়ে গেলে এত লোক কেনো চিন্তিত হবে! তারা সবাই

কেনো তাকে নিয়ে ভাববে? সে তো আর দেশের প্রধানমন্ত্রী নয়!

পথ ভুলে যাওয়ার কথা শুনে মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে একগাল হেসে সোহান বলে,

- ছোট বেলায় একবার হারিয়ে গিয়েছি বলে কি এই বুড়ো বয়সে পথ ভুলে যাবো নাকি?

- বুড়ো না ছাই! এখনও তোমার চোখই ফোটেনি।

- আমার চোখ ফোটেনি? এই যে দেখো বলে, চোখ গুলো গোল্লা গোল্লা করে তার মার দিকে তাকায় সোহান।

- ওসব ছেলেমি ছাড়ো। হাত-মুখ ধুয়ে ভাত খাবে চলো।

খাওয়ার কথা শুনে সোহানের চেপে রাখা খিদেটা চাঙা হয়ে ওঠে। তাড়াতাড়ি হাত-মুখ ধুয়ে আসে। তার মা ততক্ষণে খাবার সাজিয়ে ফেলেছেন। হাত-মুখ ধুয়ে সোহান খাবারের বিছানায় বসলো। খাবার পরিবেশন করার জন্য তার মা পাশেই বসে আছেন।

- আজকে আমি তোমার হাতে খাবো মা।

কথাটি শুনে হাসতে হাসতে সোহানের মা বলে,

- বুড়ো ছেলের কথা শোনো। এখন কি আর আমার হাতে খাওয়ার বয়স আছে?

সোহান কিছু যুক্তি-তর্ক করার চেষ্টা করে কিন্তু তার আগেই তার দাদীর কথা শোনা যায়। ষাটের অধিক বয়সের একজন অতি বৃদ্ধ যেভাবে কথা বলে সেরকম ভাঙা ভাঙা কণ্ঠে তিনি বলেন,

- আহা! ছেলেটা শখ করছে, হাতে করে খাইয়ে দাও বৌমা। বাপ মরা ছেলে আমার।

সোহানের মা ভাতের থালাটি হাতে তুলে নেয়। পরম যত্নে এক মুঠো করে ভাত তুলে দেয় সোহানের মুখে। বাচ্চাদের মতো হাম-হাম করে খেতে থাকে সোহান। থালের ভাত প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, হঠাৎ সোহানের নজর পড়ে তার মায়ের মুখের দিকে। সোহান লক্ষ্য করে তার মা কাঁদছে। চোখের পানিতে তার দুটি গাল ভেসে যাচ্ছে।

- কি হয়েছে মা! কাদছো কেনো?

সোহানের মা কোনো উত্তর দেয় না কেবল আলতো ভাবে আর এক গাল ভাত সোহানের মুখে পুরে দেওয়ার চেষ্টা করে। সোহান মুখ ঘুরিয়ে নেয়। চিৎকার করার মতো করে বলে,

- দাদি, মা কাঁদছে কেনো? তুমি কি বকা-ঝকা করেছো নাকি?

- তওবা, তওবা। আমার এক পা ঘরে আরেক পা গোরে। আমি কি আর মানুষের জ্বালা-যন্ত্রনা দেবো? পাগলি মেয়েটা নিশ্চয় রবুর কথা মনে করে কাঁদছে।

রবু নামটি সোহান বেশ কয়েকবার শুনেছে। সে জানে এটা তার বাবার নাম। রবিউল ইসলাম। আদর করে দাদা-দাদি ডাকতেন রবু।

- তুমি বাবার কথা মনে করে কাঁদছো, মা? যে কিনা মরে শেষ হয়ে গেছে .....

সোহানের কথা শুনে তার মা চমকে ওঠে।

- ছিঃ ছিঃ বাবা, এভাবে বলো না। মরে কি আর মানুষ শেষ হয়? মরণের পর আরেকটা জীবন শুরু হয়। আখিরাতের জীবন। সেই জীবনে তোমার বাবার সাথে দেখা করার জন্য চিরটাকাল অপেক্ষা করছি আমি।

বলতে, বলতে স্বামীর চেহারাটা ভেসে ওঠে রেহানা বেগমের চোখের পর্দায়। মুখভর্তি কালো দাড়ি, মাথায় একটা কাপড়ের টুপি পরে থাকতো সব সময়। নামায-কালাম করতো। গ্রামে ওয়াজ-নসিহত হলে সারা রাত মাঠে বসে ওয়াজ শুনতো। প্রায়ই বলতো,

- রেনু তোমাকে আমার পছন্দ হয়েছে। বউ হিসেবে তুমি খারাপ না।

লজ্জায় তখন রেহানা বেগমের চোখ-মুখ লাল হয়ে যেতো। রবিউল ইসলাম আবার শুরু করতেন।

- ওয়াজে শুনলাম স্বামী যদি স্ত্রীর আগে মারা যায় আর স্ত্রী বিয়ে না করে তার জন্য অপেক্ষা করে তারা দুজন জান্নাতী হলে চিরকাল স্বামী-স্ত্রী হিসেবে থাকতে পারবে। জান্নাতে কত সুখ! কোনো কাজ-কর্ম নেই। তুমি কি আমার জন্য অপেক্ষা করতে পারবে, রেনু?

রেহানা বেগম স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে থাকতো। এসব কথার অর্থ কি সেটা সে তখনও বুঝতো না। শুধু বলতো,

- আপনি যা বলবেন আমি তাই করবো।

- নামায পড়বা, রোজা রাখবা, সবর করবা।

রেহানা মাথা নাড়ে। এগুলো তো কঠিন কাজ নয়। সোহানের কণ্ঠ আবার বাস্তবে ফিরিয়ে আনে রেহানা বেগমকে।

- দেখো মা। দুনিয়ার সব বঘা-বাঘা নাস্তিকরা বলে, মৃত্যুই শেষ। তারপর আর কোনো জীবন নেই।

- ঐ সব অভাগা নাস্তিকদের কথা বাদ দে তো তুই। ওদের কি আর বুদ্ধি সুদ্ধি

আছে?

সোহানের দাদী খেঁকিয়ে ওঠেন,

- হাতের কাছে একটা পেলে হতো। এই লাঠি দিয়ে তার মাথা ফাটিয়ে জীবন শেষ করে দিতাম।

দাদীর কথা শুনে সোহান হো হো করে হেসে ওঠে। দাদী কিন্তু হাসেন না। তিনি ইয়ার্কীর ছলে কথাটি বলেন নি। সত্যি সত্যি বলেছেন। রাগান্বিত কণ্ঠে তিনি বলতে থাকেন,

- আমার অমন সোনার ছেলের জীবন যারা শেষ করে দিতে চায় হাজার-হাজার মরা মানুষের জীবন যারা শেষ করে দিতে চায় আমি তাদের নিপাত করে ছাড়বো।

দাদীর মুখের দিকে চেয়ে থাকে সোহান। ভীষণ রেগে গেছেন তিনি। সোহানের মনে হয় যদি দাদী বুঝতে পারে সে নিজেই একজন নাস্তিক তাহলে হয়তো লাঠি দিয়ে তার মাথাও ফাটিয়ে দেবে।

- ঠিক আছে, দাদী। যদি রাস্তা-ঘাটে কোনো নাস্তিককে পাই ভুলিয়ে-ভালিয়ে তোমার কাছে ধরে আনবো। আমি তাকে চেপে ধরবো আর তুমি লাঠি দিয়ে তার মাথা ফাটিয়ে দেবে কেমন? এখন চলো, ঘুমাতে যায়।

- হ্যা মা। আপনি তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ুন আবার তো রাতে উঠবেন, নামায পড়ার জন্য।

সোহানের মায়ের কথাটি শেষ হতেই যে যার ঘরে চলে যায় ঘুমানোর জন্য। কিছুক্ষণের মধ্যেই সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে বলে মনে হলো। কারো কোনো সাড়া শব্দ নেই। কেবল সোহান জেগে আছে। তার ঘুম আসছে না। কেবলই বিভিন্ন ভাবনা উদয় হচ্ছে তার অন্তরে-

অন্য মানুষ থেকে সে কত আলাদা! একটা অপরিচিত ছেলের বাবা মারা গেছে শুনে ভিন দেশের জাকের ড্রাইভার তাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে পারে, তার মা একজন মৃত মানুষের স্মৃতিকে আঠার বছর ধরে বুকে করে রাখতে পারে কিন্তু সে তো কখনও মৃত্যু নিয়ে চিন্তা করে না। নিজের বাবার মৃত্যু এমনকি তার নিজের মৃত্যুও তার কাছে গুরুত্বপূর্ণ কোনো বিষয় নয়। তবে কি জামসেদ মোল্লাহর কথাই ঠিক! সে কি আসলে মানুষ নয়!

মৃত্যু শব্দটা নিয়ে আরো কিছুক্ষণ চিন্তা করে সোহান। মৃত্যু কি খুব কঠিন বা ভয়ংকর কিছু? তার কাছে এখনও তেমনটি মনে হয় না। সে মৃত্যুকে ভয় পায় না। মৃত্যু নিয়ে তার কোনো চিন্তা হয় না। কি আশ্চর্য!

এসব ভাবতে ভাবতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিল তা সে জানে না। ঘুমের মধ্যে সোহান দেখে একটা প্রশস্ত ফাকা জায়গা। চারিদিকে সোনালী আলো চিক-চিক করছে। যতদূর চোখ যায় কেবলই শূন্যতা, ধূ-ধূ প্রান্তর। হঠাৎ কেউ একজন তার ডান হাতটা চেপে ধরে। আতংকে শিউরে ওঠে সে। মাথা তুলে তাকাতেই দেখা যায় লোকটিকে। সোহানের মনে হয় এর আগেও সে লোকটাকে কোথাও দেখেছে কিন্তু কোথায়!

- কেনো ঐ যে ট্রেনের মধ্যে?

সোহান আরো বেশি ভয় পেয়ে যায়। মানুষের মনের কথা বুঝতে পারে নাকি লোকটা।

- পারি বৈকি! মানুষের মনের কথা যদি বুঝতে নাই পারবো তাহলে এতকাল মানুষ নিয়ে গবেষণা করে আর কি লাভ হলো আমার!

সোহান এতক্ষণে লোকটাকে চিনতে পারে। না-না মানুষ নয় সেতো মৃত্যু নিয়ে গবেষণা করে। এর নাম 'মৃত্যুদূত'। সোহানের মনে হয় শত-সহস্র বছর পূর্বে কোনো এক দিন এই লোকের সাথে তার পরিচয় হয়েছিল। সেদিনের কথা তার ভাল মনে নেই শুধু লোকটির নাম মনে আছে।

- আপনি এখানে কি করছেন?

- তোমার অপেক্ষায় ছিলাম।

সোহান ভীষণ অবাক হয়।

- আমার অপেক্ষায়? আপনি কি জানতেন আমি এখানে আসবো?

- শুধু তুমি নয় বাবা প্রত্যেকটি মানুষ এখানে আসবে। এ হলো মৃত্যুপুরী।

- মৃত্যুপুরী? সে আবার কি?

- মৃত্যুপুরী হলো মৃত্যুর এলাকা। এখানে মৃত্যু থাকে। প্রতিটা মানুষ তার সাথে সাক্ষাত করে।

সোহানের মনে হয় মৃত্যু খুব একটা মজার জিনিস সে উচ্ছাসিত হয়ে বলে,

- আমি মৃত্যুর সাথে সাক্ষাত করতে চাই। আমাকে নিয়ে চলুন।

- হু তোমাকে আমি নিয়ে যাবো। নিয়ে যাওয়ার জন্যই তো এসেছি। তুমি স্বেচ্ছায় যেতে না চাইলে আমি তোমাকে এই শিকল দিয়ে বেঁধে নিয়ে যাবো।

সোহান দেখে মৃত্যুদূতের হাতে মোটা শিখের তৈরী একটা ভয়ংকর শিকল। শিকল দেখেই তার পিলে চমকে যায়।

- তার কোনো প্রয়োজন হবে না। আমি স্বেচ্ছায় যাবো।

কথাটি শেষ হওয়ার আগেই মৃত্যুদূত সোহানের হাত ধরে হাটতে শুরু করে।

তারা দু’জন কতক্ষণ হেটেছে তার হিসাব নেই আর কতক্ষণ হাটতে হবে তাও জানা নেই। চারিদিকে কেবল ধূ-ধূ প্রান্তর কিছুই দেখা যায় না। বহু দূরে একেবারে দিগন্তের সীমান্তে একটা বিন্দুর মতো দেখা যায়।

- ঐ যে, ঐ তো মৃত্যুকে দেখা যাচ্ছে।

সোহান সেদিকটাই অপলক তাকিয়ে থাকে। তার মনে হয় সেখানে পৌছাতে আরো শত-সহস্র বছর লেগে যাবে। কিন্তু সহসা তাদের চোখের সামনে দৃশ্যমান হয় একটি ছায়ামূর্তি। প্রথমে মনে হয় কালো ধোয়ার মতো। পরে আস্তে আস্তে চোখের সামনে সব কিছু স্পষ্ট দৃশ্যমান হয়। দেখতে মানুষের মতো একটা প্রাণী। একটা পাতার ঠিক মাঝখানে যেমন শিরা থাকে। প্রাণীটির ঠিক নাক বরাবর তেমন একটা দাগ পুরো শরীরটাকে দুভাগে বিভক্ত করেছে। বাম দিকটা কালো আর ভীষণ কুৎসিত ডান দিকটা ঠিক তার বিপরীত অপরূপ সুন্দর যেনো ঝলমল করছে। সোহান চারপাশে চোখ বুলায়। মৃত্যুদূতকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না যেনো হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে। ছায়ামূর্তিটিকে সোহান প্রশ্ন করে,

- তুমি কে?

- লোকে আমাকে মৃত্যু বলে ডাকে।

- লোকে যদি তোমাকে মৃত্যু বলেই ডাকে তবে তুমি জীবিত কেনো?

প্রশ্নটি শুনে ছায়া-মূর্তিটি হেসে ওঠে। দুলতে-দুলতে বলে,

- আমাকে সবাই মৃত্যু বলে ডাকে মৃত তো আর বলে না!

সোহানের মনে হয় এই কথার মধ্যে যথেষ্ট যুক্তি আছে। মৃত্যু আর মৃত তো আর এক জিনিস নয়। তাই মৃত্যুকে যে মৃতই হতে হবে এটা সঠিক নয়।

- তোমার দুদিকটা দু’রকম কেনো? মানুষকে ভয় দেখানোর জন্য বুঝি? মানুষকে ভয় দেখানোই কি তোমার কাজ?

- ভয় অভয় উভয়ই আমার কাজ। মৃত্যু কারো জন্যে হয় ভাল কারো জন্যে খারাপ। মুমিন ব্যক্তি মৃত্যুর পর জান্নাতী হয় আর কাফির মৃত্যুর পর জাহান্নামে যায়। তাই আমার দুদিক দু’রকম দেখতে। এটা দেখে তোমার ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই।

- না-না। আমি তোমাকে দেখে মোটেও ভয় পায় নি। আমি মৃত্যুকে ভয় পায় না।

কথাটি শুনে হো হো করে হেসে ওঠে মৃত্যু নামের এই প্রাণীটি। সোহান দেখে তার

দাঁতগুলো এমনকি জিহ্বা পর্যন্ত কালো আর সাদা দুটি ভাগে বিভক্ত।

- দেখো ভয় না পাওয়াটা সব সময় বাহাদুরী বোঝায় না। ভয় না পাওয়া দুরকম হয়। একটা হলো বোকামী আর অন্যটা বুদ্ধিমত্তা। বাচ্চা ছেলেরা সাপ দেখলে ভয় করে না কারণ তারা সাপ সম্পর্কে কিছুই জানে না। সাপের কামড় আর বিষ সম্পর্কে তাদের কোনো ধারনা নেই বলেই সাপ আর দড়ি তাদের কাছে সমান। আবার সাপুড়েও সাপ দেখে ভয় পায় না কারণ কোন সাপের বিষ দাঁত কোথায় থাকে সে সম্পর্কে সে জানে তাই বিষদাঁত ভেঙে দিয়ে সারাদিন সাপ খেলা দেখায়। এই দুটো মানুষের ভয় না পাওয়া কিন্তু এক রকম নয়। চিন্তা করে দেখো তো, তোমার ভয় না পাওয়াটা এদুটোর মধ্যে কোনটার সাথে মেলে।

সোহান দুটো উদাহরণ নিয়ে চিন্তা করে। তার মনে হয় তার উদাহরণটা বোকামির পর্যায়েই পড়ে। মৃত্যু সম্পর্কে সে কিছুই জানে না। কখনও জানার চেষ্টা করে নি। না জানার কারণেই হয়তো মৃত্যু সম্পর্কে কোনো ভয় তার অন্তরে নেই। সে ঐ অবুঝ বাচ্চার মতো যে সাপ সম্পর্কে কিছুই জানে না। তাই সাপকে ভয় পায় না। সাপ নিয়ে খেলা করার চেষ্টা করে। কিন্তু সাপ তো তাকে ছাড়ে না। ঠিকই ছোবল দিয়ে সর্বনাশ করে দেয়। এরই মধ্যে আবার অদ্ভুত প্রাণীটির কণ্ঠ শোনা যায়।

- দেখো তোমার উদাহরণ ঐ সব পতঙ্গের মতো যারা আগুন সম্পর্কে জানে না। তারা কেবল আগুনকে আলো মনে করে কিন্তু আগুন যে উত্তপ্ত সেটা তারা জানে না। তাই আগুনকে ঘিরে লাফা-ঝাপা করে বোকার মতো আত্মাহুতি দেয়।

সোহানের মনে হয় উদাহরণটি যথাযোগ্য হয়েছে। সে তো আসলেই মৃত্যু নিয়ে কখনও ভাবে নি। মৃত্যু কি, মৃত্যু কেমন সে সম্পর্কে তার কোনো ধারনা নেই। তাই মৃত্যুকে ভয় না পাওয়াটা তার জন্যে বাহাদুরি নয় বরং বোকামি। সে মনোযোগ দিয়ে মৃত্যু নামের এই ছায়ামূর্তিটির হিতকারী উপদেশ শুনতে থাকে।

- মুমিন বান্দা মৃত্যুকে ভয় পায় না কারণ সে মৃত্যু সম্পর্কে জানে। মৃত্যুর ক্ষতি হতে বাঁচার জন্য সকল প্রকার প্রস্তুতি তার থাকে। বিষদাঁত ভেঙে দেওয়া সাপ যেমন সাপুড়ের ক্ষতি করার বদলে তার উপায়-উপার্জনের মাধ্যমে পরিনত হয়তেমনি মুমিন ব্যক্তির মৃত্যু তার জন্য ক্ষতির কারণ হয় না বরং মুমিনের মৃত্যু জান্নাতের দরজা হিসাবে গণ্য হয়। মৃত্যু তার চিরস্থায়ী সুখী জীবনের সূচনা করে। কিন্তু কাফিররা মুত্যুকে গুরুত্ব দেয় না, মৃত্যু নিয়ে ভাবে না, মৃত্যুর জন্য কোনো প্রস্তুতি গ্রহণ করে না। তাই বলে, মৃত্যু কি তাদের ছেড়ে দেয়?

সোহান মাথা নাড়ে। মৃত্যু কাউকে ছাড়ে না। ছেলেকে মায়ের কোল থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যায়। চোখের সামনে স্বামীকে স্ত্রীর নিকট থেকে এবং স্ত্রীকে স্বামীর নিকট থেকে আলাদা করে দেয়। এটা সতসিদ্ধ। ছায়ামূর্তিটি বলতে থাকে,

- মৃত্যুকে ভয় না করলেই মৃত্যু তোমাকে ছেড়ে দেবে না। তোমাকে পাকড়াও করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে। তাই পরাজিত করতে হলে, মৃত্যু সম্পর্কে জানতে হবে। মত্যুকে নিয়ে ভাবতে হবে। মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে। কেবল অহমিকা করে বললেই হবে না

- আমি মৃত্যুকে ভয় করি না।

কথাটি শেষ হতে না হতেই ছায়ামূর্তিটি অদৃশ্য হয়ে যায়। সোহানের মুখের সামনে ভেসে ওঠে একটি বৃদ্ধের হাস্যজ্বল মুখ। তার হাতে একটা মোটা শিকল।

- তুমি ফিরে যাও তোমার কাজ শেষ।

সোহান বুঝতে পারে না সে কোথায় ফিরে যাবে। চারিদিকে শুধু খোলা প্রান্তর। যাওয়ার তো কোনো জায়গা নেই! সে শুনতে পায়, বহু দূর থেকে সুমধুর কন্ঠের একটা সূর ভেসে আসছে। কথাগুলো ভালোভাবে বোঝা যাচ্ছে না। কেবল সুরটা শোনা যাচ্ছে, সত্যিই সুমধুর সুর!

সোহানের ঘুম ভেঙে যায়। তখন ফজরের আজান হচ্ছে। দাদী লাঠির উপর ভর করে ঠক-ঠক করে হেঁটে বেড়াচ্ছেন। মা হয়তো এখনও ঘুমাচ্ছেন। দাদী এখনই তাকে ফজরের নামাজ পড়ার জন্য ডাকবেন। প্রতিদিনকার রুটিন।

তিন.

বেশ কয়েক বছর পরের কথা। সোহান এখন সাংসারিক জীবনে প্রবেশ করেছে। একই সাথে এটা তার কর্ম জীবনও বটে। সে এখন পুকুরঘাটা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করে। চাকুরী পাওয়ার পর তার মা আর দাদী অনুসন্ধান করে একটা অসম্ভব ভাল মেয়ে মানুষের সাথে তার বিয়ে দিয়ে দিয়েছে। বিয়ের পর তার একটা মেয়ে সন্তান হয়েছে। মা-দাদী আর বৌ-বাচ্চা নিয়ে তার সংসার যেনো সাজানো বাগানে পরিণত হয়েছে। সব মিলিয়ে তার জীবনটা অর্থবহ হয়ে উঠেছে। এখন তার মনে হয় সে একটা সুখী মানুষ। সোহান তার আশপাশের লোকদের মাঝেও সুখ বিলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। নিজের পরিবারের সদস্য, বন্ধু-বান্ধব, স্কুলের ছাত্র, সবার সাথে সে উত্তম আচরণ করে। ক্লাসের ছাত্রদের সে প্রায়ই মজার-মজার গল্প শোনায়। জমির স্যারের মতো অংক শেখানোর গল্প নয়, সে গল্প বলার জন্যই গল্প বলে। তবে গল্পের মাধ্যমে দু' একটা শিক্ষণীয় বিষয় যে শেখায় না তা নয়। সেদিন ক্লাসে ঢুকেই সে ছাত্রদের উদ্দেশ্যে বলল,

- আজ আমি তোমাদের একটা মজার গল্প শোনাবো।

তার কথা শুনে ক্লাস ভর্তি ছাত্ররা আনন্দে নেচে উঠলো। সবাই সমস্বরে বলে উঠলো,

- বলুন স্যার, বলুন।

সোহান ভাল একটা গল্প মনে করার চেষ্টা করে। বেশ কিছুক্ষণ চেষ্টা করার পরও তেমন কোনো গল্প তার মনে পড়ে না। তার মাথার মধ্যে কেবলই জমির স্যারের অংক শেখানো গল্পটি ঘুর ঘুর করছে। উপায়ান্তর না দেখে সোহান শেষ-মেষ জমির স্যারের গল্পটিই বলতে শুরু করে,

- একজন লোক পাঁচটি মিষ্টির হাড়ি নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে শ্বশুর বাড়ি বেড়াতে যাচ্ছিল। অনেকটা পথ হাঁটার পর সে ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়ে। রাস্তার পাশে ছিল একটা বট গাছ। লোকটি মিষ্টির হাড়ি পাশে রেখে বট গাছের নিচে ঘুমিয়ে পড়ে। সে ঘুমিয়ে পড়ার পর এক দল দুষ্টু ছেলে এসে এক হাড়ি মিষ্টি সাবার করে পালিয়ে যায়।

এতদূর বলেই সোহান থেমে যায়। এখন তার মনে পড়ে, জমির স্যার গল্পটি শেষ পর্যন্ত বলেন নি। আগে জানলে কি আর সে এই গল্প ছাত্রদের শোনাতে যেতো! মনে মনে শত-সহস্র বার জমির স্যারকে দোষারোপ করে সে। ওদিকে ছাত্ররা অধৈর্য হয়ে ওঠে-

- তারপর কি হলো স্যার? তারপর ..

সোহান গুরুতর সমস্যায় পড়ে যায়। এ অবস্থা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার পন্থা তালাশ করতে থাকে সে। প্রথমে মনে হয়, সোজা-সাপটা বলে দিই- আমার মনে নেই কিন্তু পরক্ষণেই বুঝতে পারেএটা ঠিক হবে না। প্রায় প্রতিদিনই সে ছাত্রদের স্মরণ শক্তির উপর লম্বা চওড়া বক্তৃতা শোনায়। এখন যদি সে নিজেই বলে আমি ভুলে গেছি তবে তো দফা রফা। মাঠ ভর্তি দর্শককে গান শোনানোর জন্য মঞ্চে উঠার পর গানের কোনো কলি ভুলে গেলে যে অবস্থা হয় সোহানের অবস্থা অনেকটা সেরকম হয়। অনেক আগে শোনা একটা গল্পের কথা মনে পড়ে যায় তার। তখন সে মণিরহাটা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সবেমাত্র ভর্তি হয়েছে। নওশের স্যার ছিলেন স্কুলের সংস্কৃতি বিষয়ক শিক্ষক। নিয়ম ছিল প্রতি বৃহস্পতিবার দ্বিতীয় ঘন্টার পর স্কুলের মাঠে সংস্কৃতি চর্চা হবে। সংস্কৃতি চর্চা মানে স্কুলের সব ছাত্রদের সামনে গান গাওয়া, কবিতা আবৃত্তি, গল্প পাঠ ইত্যাদি। নওশের স্যার যতটা সহজ মনে করেছিলেন কাজ কিন্তু ততটা সহজ হলো না। গান শোনার জন্য লোক পাওয়া যায় বটে কিন্তু গান গাইবে কে? সোহানের মনে পড়ে প্রথম যেদিন নওশের স্যার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন সেদিন দ্বিতীয় ঘন্টার পর ছাত্রদের মাঠে ডাকা হলো। নওশের স্যার প্রথমেই সংস্কৃতি চর্চার গুরুত্ব সম্পর্কে আধা ঘন্টা আলোচনা করলেন। সাংস্কৃতি চর্চা করলে, জ্ঞান-বুদ্ধি বৃদ্ধি পায়, মন ভাল থাকে, শরীর সুস্থ থাকে ইত্যাদি। তারপর যারা

যারা গান গাইতে বা কবিতা আবৃত্তি করতে আগ্রহী তাদের সামনে আসার নির্দেশ দিলেন। কিন্তু দেখা গেল কেউ এ ধরনের দায়িত্ব পালনে আগ্রহী নয়। মাঠ ভর্তি ছাত্ররা মাথা নিচু করে বসে রইলো। তারা গান শুনতে এসেছে গাইতে নয়। নওশের স্যারও ছেড়ে দেওয়ার পাত্র নন। তিনি বললেন,

- তোমরা নিশ্চয় লজ্জা পাচ্ছো? এখানে লজ্জা পাওয়ার কিছু নেই। এই যে, দেখো আমি তোমাদের একটি গান গেয়ে শোনাচ্ছি-

এরপর নওশের স্যার যে গানটি শোনালেন সেটা ছিল সুপার হাইব্রিড প্রকৃতির। গানটির বিভিন্ন কলি বিভিন্ন গান থেকে কেটে নেওয়া। গানের সূরও ছিল কাকতালীও। যখন যেদিকে যায়। নওশের স্যার গান গাওয়ার নামে মিনিট পাঁচ-সাত গ্যান-গ্যান করার পর বললেন,

- এবার তোমাদের পালা। যারা গান গাইতে চাও উঠে এসো।

নওশের স্যারের গান শুনে ছাত্রদের উৎসাহ বৃদ্ধি পেয়েছে বলে মনে হলো না। তারা কেউই গান গাওয়ার জন্য উঠে এলো না। স্যার নিজেও দ্বিতীয় কোনো গান পরিবেশনের চেষ্টা করলেন না। সবাইকে ছুটি দিয়ে দিলেন। এর পরও বেশ কয়েকদিন নওশের স্যার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করার চেষ্টা করেছেন কিন্তু সে চেষ্টায় সফলতা না পেয়ে তিনি এসব চিন্তা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলেন। তবে ক্লাসে তিনি এ নিয়ে প্রায়ই আক্ষেপ করতেন। বলতেন,

- জোর করে কি আর কারো দিয়ে গান গাওয়ানো যায়! জোর করে গান গাওয়ালে মান থাকে না। হিতে বিপরীত হয়।

এরপর তিনি একটা গল্প বলতেন,

- এক স্কুলের হেড মাস্টার ছিলেন সংস্কৃতি মনা। তিনি একবার স্কুলে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করার সিদ্ধান্ত নেন। সব কিছু ঠিক-ঠাক ছিল কেবল গান গাওয়ার লোক ছিল না। শত অনুরোধ করেও কাউকে রাজী করানো গেলো না। শেষ-মেষ তিনি বুঝতে পারলেন, সোজা আঙ্গুলে ঘি উঠবে না। স্কুলের ছাত্রদের মধ্যে অনেক দেখে শুনে-তিনি বগা নামের এক ছেলেকে বললেন,

- এই যে, বগা তোমাকেই কিন্তু গান গাইতে হবে। গান না গাইলে আমি চাটি মেরে তোমার দাঁতের পাটি খুলে দেবো।

স্যারের কথা শুনে তো বগা হতভম্ব হয়ে গেলো। ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে বলল,

- আমি গান গাইতে পারি না স্যার।

- পারবো না বললেই তো আর আমি ছাড়বো না বাছাধন! গান তোমাকে গাইতেই

হবে।

হেড স্যার ঠিক করে দিলেন, বগা এই গানটি গাবে,

ও আমার দেশের মাটি – তোমার পরে ঠেকায় মাথা

বগা অনেক কষ্ট-ক্লেশ করে গানটি মুখস্থ করার চেষ্টা করল, কিন্তু যথা সময়ে ঘটলো বিপত্তি। মঞ্চে উঠে গান গাওয়ার সময়,

'ও আমার দেশের মাটি .. এতদূর বলেই থেমে গেলো বগা।

বাকিটুকু কিছুতেই মনে পড়ছে না তার। হেড মাস্টার সাহেব মঞ্চেই বসে ছিলেন। বগা একবার মাথা তুলে তার দিকে তাকাতেই তিনি হাত উঁচু করে চাটি মারার কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন বগাকে। এতে কাজ হলো, বগা এবার নিজ দায়িত্বে গান গাওয়া শুরু করলো,

ও আমার দেশের মাটি,

তোমার তরে খাবো চাটি

হেড মাস্টার বড়ই টাকি

খুলে দেবে দাঁতের পাটি।

গল্পটি নওশের স্যার প্রায়ই বলতেন। ছাত্ররা শুনে হো হো করে হেসে দিতো। স্যার অবশ্য হাসতেন না। সাংস্কৃতিক কার্যক্রম ব্যর্থ হতে দেখে তিনি আসলেই ব্যাথিত হয়েছিলেন।

সোহানের মনে হয় বগার কাহিনীতে শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। সেও তো পারে জমির স্যারের অসমাপ্ত গল্পটির বাকি অংশ নিজে থেকে বানিয়ে বলতে। সে শুরু করে,

- তারপর, যখন লোকটির ঘুম ভেঙে গেলো। একটি মিষ্টির হাড়ি খালি পড়ে রয়েছে দেখে সে ভীষণ কান্না-কাটি শুরু করল। সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিল এক বয়স্ক লোক। লোকটি তাকে সব ঘটনা খুলে বলল। সব শুনে সে বলল,

- আমি এই এলাকার মেম্বার, তুমি যদি আমাকে এক হাড়ি মিষ্টি দাও তবে আমি এর বিচার করে দেবো।

লোকটি তার কথা বিশ্বাস করে তাকে এক হাড়ি মিষ্টি দিলো। লোকটি বলল, তুমি এখানে বসো। আমি বাড়ি থেকে ঘুরে আসছি। আসলে সে মিথ্যা বলেছিল। সে এক হাড়ি মিষ্টি নিয়ে চলে গেল আর ফিরে আসলো না।

এর পর এলো আরেক জন। সে বলল, আমি এই এলাকার চেয়ারম্যান আমাকে যদি তুমি এক হাড়ি মিষ্টি দাও তবে তোমার বিচার করে দেবো। লোকটি তার কথায়

বিশ্বাস করে তাকেও এক হাড়ি মিষ্টি দিল। কিন্তু সেও ছিল মিথ্যুক সে মিষ্টি নিয়ে চলে গেল আর ফিরে আসলো না।

এভাবে একের পর এক কয়েকজন লোক আসলো আর লোকটি তাদের সবাইকে এক হাড়ি করে মিষ্টি দিল। তারা সবাই ছিল মিথ্যুক। তারা মিষ্টি নিয়ে চলে গেলো আর ফিরে এলো না। এভাবে লোকটির সব মিষ্টি শেষ হয়ে গেলো। লোকটি আর শশুর বাড়ি যেতে পারলো না সে বাড়ি ফিরে গেলো।

সোহানের মনে হলো গল্পটি সে ভাল মতোই শেষ করতে পেরেছে। সে ক্লাসে সবার মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছে তারা মোটা-মুটি আনন্দ পেয়েছে। সোহান মুচকি হেসে বলল,

- এবার আমি তোমাদের একটা প্রশ্ন করবো। ঠিক আছে?

এ বিষয়ে কারো আগ্রহ আছে বলে মনে হলো না। এদিক-সেদিক থেকে দু' একজন কেবল হ্যাঁ হু জাতীয় শব্দ করলো, বাকীরা নীরবতা অবলম্বন করল।

- এই গল্প থেকে আমরা কি শিখলাম? কে কে বলতে পারবে হাত তোলো।

সোহান গুনে দেখলো ৩০-৩৫জন ছেলের মধ্যে মাত্র ৫ টি ছেলে হাত উঠিয়েছে। সোহান একে একে তাদের প্রত্যেকের কথা শোনে।

একজন বলে,

- এই ঘটনা থেকে আমরা বুঝতে পারি অপচয় করা মহাপাপ। পাঁচ হাড়ি মিষ্টি কেনার কোনো প্রয়োজন ছিল না। এক হাড়ি হলেই যথেষ্ট হতো। অপচয় না করা সম্পর্কে কি যেনো একটা কবিতাও আছে। ও হ্যাঁ মনে পড়েছে,

যে দিনের বেলা অকারনে বাতি জ্বালায়

রাতের বেলা তার বাড়িতে বাতি থাকে না।

কবিতার চরণদুটি এভাবে বিকৃত হতে দেখে সোহান ভুরু কুঞ্চিত করে। বোঝায় যাচ্ছে স্মরণ শক্তির উপর যথেষ্ট পরিমানে আলোচনা করলেও এদের সামান্যতমও উন্নতি হয়নি। তবে এখানে মুল ভাব বোঝা গেলেই যথেষ্ট হবে মনে করে সোহান এসব নিয়ে আর ঘাটা-ঘাটি করে না। ছেলেটি বলতে থাকে,

- অপচয় করে পাঁচ হাড়ি মিষ্টি কেনার কারণেই তো শেষ-মেষ তার কপালে এক হাড়ি মিষ্টিও জুটলো না।

ছেলেটি আরো কিছু বলতে যাচ্ছিল, সোহান হাত নেড়ে তাকে বসতে বলল।

পরের দুজন অলসতা করে ঘুমিয়ে পড়া এবং বোকামি করে ভণ্ড লোকদের হাতে মিষ্টির হাড়ি তুলে দেওয়ার বিষয়ে তীব্র আপত্তি উত্থাপন করলো।

পরের জন বলল,

- এই ঘটনাটি থেকে আমরা বুঝতে পারি কৃপণতা সকল অনিষ্টের মূল।

এই ছেলের কথা শুনে সোহান যেনো আকাশ থেকে পড়লো।

- কৃপণতার তুমি এখানে পেলেটা কি, হ্যাঁ।

- এই লোক টাকা বাঁচানোর জন্য হেঁটে শ্বশুর বাড়ি যাচ্ছিলবলেই তো ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল। ভ্যান-রিকশায় গেলে তো আর সে ক্লান্ত হতো না, মিষ্টির হাড়ি ফেলে রেখে ঘুমোতেও হতো না। ছেলে-পুলে এসে তার মিষ্টিগুলোও ....

তার কথা শেষ হওয়ার আগেই সোহান তাকে থামিয়ে দেয়। এই সব ক্ষুদে পণ্ডিতদের কথা শুনে তার মাথা ব্যাথা হওয়ার উপক্রম হয়েছে। আর কারো কথা শুনতে ইচ্ছা হচ্ছে না। কোণার দিকে আর একটা ছেলে হাত তুলে রয়েছে। তার কথাটা না শুনলে অন্যায় হয়ে যায় ভেবে সোহান তাকে উঠতে বলে। সে বলে,

- সব দোষ কি ঐ লোকটার? যারা মিষ্টিগুলো খেয়ে নিলো তাদের কি কোনো দোষই নেই! তাদের যদি মরণের ভয় থাকতো তাহলে কি আর অসহায় লোকটাকে ফাঁকি দিতে পারতো!

এই কথাটি সোহানের খুব ভালো লাগে। তার কাছে মনে হয়, অসহায় দুর্বলকে দোষারোপ না করে অপরাধীকে প্রতিহত করার শিক্ষায় সুশিক্ষা। কিন্তু মরণের ভয় কথাটি সোহানকে ভীষণ চিন্তায় ফেলে। একটা প্রশ্ন তার মনে ঘুরপাক খেতে থাকে।

- মৃত্যু কি আসলেই ভয়ের জিনিস, মৃত্যুর ভয় কি মানুষকে অপরাধ থেকে ফিরাতে পারে?

বিষয়টি সোহানের কাছে এখনও স্পষ্ট নয় তবে সে অনুভব করে মৃত্যুর কথা শুনে তার অন্তর কেমন যেনো সংকুচিত হয়ে আসছে। চোখের সামনে নিপার মুখটা ভেসে উঠলো। তারপর মা, মাধবী আর সবার শেষে দাদীর মুখটা। একটা সাজানো সংসার। সোহানের মনে হয় এই পরিবারের কোনো একজন মারা গেলে পুরো পরিবারটা মুখ থুবড়ে পড়বে। একটা সাজানো সুখের সংসার ভেঙে যাবে, অগোছালো হয়ে যাবে। এখন সোহানের মনে হচ্ছে মৃত্যু খুব একটা ছোটখাটো বিষয় নয়। ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

বাড়ি ফেরার সাথে সাথে নিপা আব্বু আব্বু বলে দৌঁড়িয়ে আসলো। এটা তার প্রতিদিনের অভ্যাস। তাকে কোলে তুলে নিলো সোহান। ছোট বাচ্চাদের মুখের ডাক যে এতটা মধুর হতে পারে এর আগে সোহান তা জানতো না। তার নিষ্পাপ মুখের দিকে মমতার দৃষ্টি দিয়ে সে বলে,

- আম্মু কোথায়? দাদী কোথায়?

নিপা এর কোনো উত্তর দেয় না। কেবল বলে,

- আম্মু? দাদী?

যেনো খুব মজার উত্তর হয়েছে এমন ভাব দেখিয়ে সোহান হো-হো করে হাসতে থাকে। নিপার কথা-বার্তা অঙ্গ-ভঙ্গি সব কিছুর মধ্যে যেনো মধু মাখা আছে। সে যাই করে সোহান তাতে ভীষণ আনন্দ পায়। নিপার মুখে কথাটি শোনার জন্য সে আবার প্রশ্ন করে,

- আম্মু কোথায়?

- আম্মু কাঁদে।

এবারের উত্তরটি কিন্তু হাস্যকর মনে হলো না। মাধবী কাঁদছে শুনে সোহান হকচকিয়ে যায়। ব্যাপার কি বোঝার জন্য চোখ-কান খাড়া করে থাকে। চারিদিকে নিরব, কোনো শব্দ শোনা যায় না। তবে এই নীরবতা স্বাভাবিক মনে হয় না সোহানের কাছে। সে অধৈর্য হয়ে ডাকা-ডাকি শুরু করে।

- মাধবী, এই মাধবী।

ভিতর থেকে মাধবীর গলা শোনা যায়,

- ওভাবে চিৎকার করো না। মা ঘুমোচ্ছেন।

পড়ন্ত বিকালে ঘুমানোর মধ্যে যে অস্বাভাবিক কিছু আছে সেটা সোহান ধরতে পারে না। ততটা বুদ্ধি এখনও তার হয়নি। তবে ঘরে যেয়ে মাধবীর চোখ-মুখ আর দাদীর বিষন্ন চেহারা দেখে সে বুঝতে পারে কিছু একটা ঘটেছে।

- কি হয়েছে? তোমাদের এমন দেখাচ্ছে কেনো?

মাধবী কোনো উত্তর দিচ্ছে না দেখে সোহান দাদীর দিকে এগিয়ে যায়।

- কি হয়েছে দাদী?

কোনো ভূমিকা ছাড়ায় দাদী সত্য কথাটা বলে ফেলেন,

- তোর মা মনে হয় আর বাঁচবে না-রে তোর বাপের কাছে চলে যাবে।

বলে অনেকটা শব্দ করে কেঁদে ওঠে সোহানের দাদী। তার সাথে মাধবীও তাল মেলায়। মাকে কাঁদতে দেখে নিপাও কাঁদতে শুরু করে। তখনও সে বাবার কোলেই ছিল। সোহান তাকে মাটিতে নামিয়ে রেখে মায়ের ঘরের দিকে চলে যায়। তার মা সত্যি-সত্যিই ঘুমোচ্ছেন। ঘুমোচ্ছেন বললে হয়তো ভুল হবে, অনেকটা নির্জীব জড়

বস্তুর মতো বিছানায় পড়ে রয়েছেন। সোহানের ইচ্ছা হয় মাকে ডেকে বলি, তোমাকে আমি কোথাও যেতে দেবো না মা। তুমি আমার কাছে থাকবে। আব্বুর কাছে যদি যেতেই হয় আমি আর তুমি এক সাথে যাবো। কিন্তু এখন মার ঘুম ভাঙানো ঠিক হবে না ভেবে সে ফিরে আসে।

- মার কি হয়েছে দাদী?

- গাঁয়ে ভীষণ জ্বর উঠেছিল। সারাটা শরীর থরথর করে কাঁপছিল।

- জ্বর হয়েছে তো কি? ডাক্তার দেখালেই সেরে যাবে।

- সব জ্বর সমান হয় না, ভাই। ডাক্তারের কাছে সব রোগের চিকিৎসা হয় না। জীবনে কি আর কম দেখলাম!

সোহান দাদীর দিকে এক নজর তাকায়। সত্তর বছরের দীর্ঘ জীবনে তিনি যে অনেক কিছু দেখেছেন তাতে সন্দেহ নেই। তার হাতের উপর মাথা রেখে মৃত্যুবরণ করেছে তার তিন ছেলে। চোখের সামনে এ গায়ের আরো কত লোককে মরতে দেখেছেন তার হিসাব নেই। তার অভিজ্ঞতাকে এক কথায় উড়িয়ে দেওয়া হয়তো সঠিক নয় কিন্তু তাই বলে সোহান তো আর চোখ বুজে মায়ের মৃত্যু দেখবে না। সে মাকে বাঁচানোর চেষ্টা করবে। ঘুম থেকে উঠলেই সে মাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবে। মনে মনে দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে সোহান।

মাগরিবের আজানের কিছুক্ষণ পর সোহানের মা ঘুম থেকে উঠলেন। খুব স্বাভাবিকভাবে বিছানা থেকে নেমে ওজু করে নামাযে দাড়িয়ে গেলেন। মা যখন নামায পড়ছিল সোহান তার দিকে অপলকে তাকিয়ে ছিল। তার মনে হচ্ছে সব কিছু স্বাভাবিক হয়ে গেছে। ঠিক গতকালের মতো। সে খুশি হয়ে বলে,

- দাদী দেখেছো? মার জ্বর সেরে গেছে। আমি বলেছিলাম না!

সোহানের দাদী কিন্তু খুশি হয়েছে বলে মনে হলো না। অজানা আশঙ্কায় তার ভিতরটা কুকড়ে যাচ্ছে। তার মনে পড়ছে রবুর কথা। তার সাত ছেলে-মেয়ের মধ্যে বড় সন্তান। রবু ছিল তার বাবার মতোই জওয়ান আর কর্মঠ। বাবার মৃত্যুর পর পুরো সংসারের দায়িত্ব ছিল তার উপর। প্রায় বিশ বিঘা জমির চাষাবাদ দেখাশোনা করতে হতো তার। খুব খাটুনি করতো সে। সেদিন মাঠ থেকে বাড়ি এসেই বলল,

- মা এক গ্লাস পানি দাও তো।

তাড়াতাড়ি তাকে এক গ্লাস পানি দিলেন তিনি। কয়েক চুমুকে পানিটুকু শেষ করে মাটির ঘরের মেঝের উপরই শুয়ে পড়লো রবু। আর তখনই যেনো তার মৃত্যু যন্ত্রনা শুরু হয়ে গেলো। ওমা, মাগো বলতে বলতে এপাশ ওপাশ করতে থাকলো। স্বামীর আর্তনাদ শুনে রেনুও ছুটে আসলো। স্বামীর পাশে বসে পাখা দিয়ে বাতাস করতে

থাকলো। তাকে দেখে রবু জোর করেই কিছুটা স্থির হওয়ার চেষ্টা করলো। তার দিকে তাকিয়ে বলল,

- আমি চলে যাচ্ছি রেণু। তুমি আমার জন্য অপেক্ষা করো। নামায পড়ো, আমার জন্য দোয়া করো। আশা করি তোমার সাথে আবার আমার দেখা হবে। মা তুমি রেনুকে দেখে রেখো। তার যেনো কোনো কষ্ট না হয়।

এসব কথা মনে পড়তেই চোখ জোড়া ছল ছল করে ওঠে সোহানের দাদীর। তার মনে হয় তিনি তার ছেলের কথা রাখতে পেরেছেন। প্রায় ২৫ বছর ধরে বুকের মধ্যে আগলে রেখেছেন রেনুকে। তাকে ছেড়ে তিনি কোথাও যান নি। তাই তো তার প্রতি তার এতো মায়া!

উঠোনে বিছানা পেতে দিলো মাধবী। নামাজ শেষ করে সোহানের মা এসে সেখানে বসলেন। সোহানের দাদীও বসলো তার পাশে। সোহান নিপাকে কোলে নিয়ে উঠানের এপাশ ওপাশ হাঁটা-হাটি করছিল আর মাকে বিভিন্ন প্রশ্ন করছিল।

- এখন তোমার কেমন লাগছে মা? ডাক্তার ডাকবো?

- না বাবা। আমার এখন খুব ভালো লাগছে।

সোহান মায়ের দিকে তাকিয়ে থাকে। তার কেনো জানি মনে হচ্ছে তার মা মনে মনে হাসছেন। মনে হচ্ছে ভিতরে ভিতরে তিনি ভীষণ আনন্দ পাচ্ছেন।

- অনেক দিন পর আজ তোমার বাবাকে স্বপ্ন দেখলাম। দেখলাম একটা গরুর গাড়ি নিয়ে এসেছেন। রাস্তায় দাড়িয়ে রেনু রেনু বলে আমাকে ডাকছেন।

কথাটি শুনে সোহনের দাদী হালকা শব্দে কেঁদে ওঠেন। তার কাঁদার কারণ কি সেটা আর কেউ বুঝতে পারে না। কেউ কোনো প্রশ্নও করে না। হঠাৎ সোহানের মায়ের অবস্থার অবনতি ঘটে। তিনি বুকে হাত দিয়ে ছটফট করতে থাকেন। নিপাকে মাটিতে দাড় করিয়ে রেখে সোহান ছুটে যায় তার কাছে। ব্যাকূল হয়ে বলে,

- মা, তুমি আমাদের ছেড়ে চলে যেয়ো না।

সোহানের দিকে তাকিয়ে তিনি বলেন,

- ওকথা বলো না বাবা। পচিশ বছর ধরে এই দিনটার জন্য অপেক্ষা করছিলাম। অনেক আগেই হয়তো চলে যেতাম। শুধু তোমার জন্য চিন্তা হতো। আল্লাহর কাছে বলতাম, তোমার যেনো সুখ হয়, সুখের সংসার হয়। আমি যেনো তোমার সুখ দেখে যেতে পারি। আমার দোয়া তিনি শুনেছেন। আমার সে শখ পুরা করেছেন। এখন তো আমার যেতে কোনো বাঁধা নেই। আল্লাহর শোকর যে তিনি আমাকে এতটা সময় দিয়েছেন। মৃত্যু আল্লাহর সিদ্ধান্ত। তুমি আমি শত চেষ্টা করেও তাকে রদ করতে

পারবো না। আজ যদি আমি যায় কাল তোমাকে যেতে হবে। মৃত্যুর জন্য তাই সদা প্রস্তুত থেকো। আল্লাহর ইবাদত করো। ।

সোহানের মা আরো কিছু বলতেন। কিন্তু ভীষণ যন্ত্রনায় তার ঠোট গুলো বাঁকা হয়ে গেলো। মুখ দিয়ে যেসব শব্দ বের হচ্ছিল তার কিছুই বোঝা যাচ্ছিল না। সোহান খুব ভালভাবে শোনার চেষ্টা করে। সে বুঝতে পারে তার মা বলছেন,

- ভীষণ কষ্ট, মৃত্যুর কষ্ট ভীষণ কষ্ট।

সোহান চমকে ওঠে। তার সামনে মৃত্যু তার মাকে কষ্ট দিচ্ছে কিন্তু সে কিছুই করতে পারছে না। মৃত্যু তার মাকে সবার সামনে থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছে যাচ্ছে কেউ থাকে ধরে রাখতে পারছে না। একারণেই কি মৃত্যু কঠিন? এজন্যই কি মৃত্যুকে ভয় করা উচিৎ!

এরই মধ্যে সোহানের মার দেহটা নিথর হয়ে যায়। তার চোখ দুটি তখনও খোলা ছিল। যেনো এখনও তিনি সোহানের দিকে তাকিয়ে আছেন। বলছেন,

- বাবা, এই তো আমি। তোমাদের মাঝেই আছি।

চারিদিকে কান্নার রোল পড়ে যায়। সোহান নিজেও কাঁদছিল। কিন্তু সে শব্দ কেউ শোনে নি। নিপা মাধবীকে জড়িয়ে ধরে কাঁদছিল কিন্তু তাকে চুপ করানোর জন্য কেউ কোলে তুলে নেই নি। একটি মৃত্যুতে সবাই ব্যথিত। কারো দিকে লক্ষ্য করার সময় কারো নেই।

সোহানের মায়ের মৃত্যুর পর বেশ কিছুদিন কেটে যায়। পরিবারের অন্য সবাই মোটামুটি স্বাভাবিক হতে শুরু করে কিন্তু সোহান কিছুতেই স্বাভাবিক হতে পারে না। শেষ মুহুর্তে মায়ের কথাগুলো তার কানে সব সময় বাজে। তার মনে হয় মৃত্যুর সময় তার মা তাকে নতুন একটি শব্দ শিখিয়েছে। "মৃত্যুর কষ্ট"। তার মনে পড়ে 'মৃত্যুদূত' নামের বৃদ্ধ লোকটির কথা, স্বপ্নে দেখা মৃত্যু নামের অদ্ভুত প্রাণীটির কথা। সে এখন বুঝতে পারে সত্যিই মৃত্যু সম্পর্কে সে ভীষণ অজ্ঞ। তার মনের মধ্যে মৃত্যু সম্পর্কে জানার আগ্রহ জন্মায়। অদম্য আগ্রহ। মৃত্যুর কষ্ট কি সেটা জানতে হবে। মৃত্যু কেনো মানুষকে কষ্ট দেয় সেটাও জানতে হবে। মৃত্যু সম্পর্কে তাকে গবেষণা করতে হবে। কিন্তু সে কার কাছে যাবে? এ সম্পর্কে কে তাকে বলতে পারবে? মৃত্যুদূত নামের লোকটি নিশ্চয় তার এসব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে কিন্তু তার ঠিকানা তো সোহান জানে না। এমন কি তার আসল নামও তার জানা নেই। বেশ কিছুক্ষণ চিন্তা করার পর সোহানের মনে পড়ে, বজলুর রহমানের কথা। সোহান যখন কলেজে পড়তো বজলু স্যার তাদের প্রাণিবিদ্যার ক্লাশ নিতেন। মানুষের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গঠন প্রণালী ও কার্যকলাপ সম্পর্কে আলোচনা করতেন তিনি। সোহানের মনে হয়, বজলু স্যার হয়তো তার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবেন। সে তখনই কলেজের উদ্দেশ্যে

রওয়ানা হয়ে যায়।

কলেজে পৌঁছে এদিক-সেদিক খোঁজ-খবর করে জানা গেলো বজলু স্যার এখন শিক্ষক মিলনায়তনে রয়েছেন। সেখানে গিয়ে সোহান দেখলো কলজের বেশ কয়েকজন প্রফেসর গল্প-গুজব করে সময় কাটাচ্ছেন। তাদের মধ্যে বজলু স্যারও রয়েছেন। সোহান সালাম দিতেই তারা সবাই এক সাথে ঘুরে তাকালো। তাকে দেখেই বজলু স্যার চিনতে পারেন। সালামের উত্তর দিয়ে বলেন,

- আরে সোহান যে! এসো ভিতরে এসো।

সে ভিতরে প্রবেশ করলে স্যার একটা চেয়ারের দিকে হাত ইশারা করে বলেন,

- বসো, কী ব্যাপার?

কোনো ভূমিকা ছাড়াই সোহান শুরু করে।

- স্যার মৃত্যুকষ্ট বলে কি কিছু আছে?

বজলু স্যার কিছুই বুঝতে পারেন না। পাশে যারা ছিল তারাও ভীষণ অবাক হয়।

- এ প্রশ্ন তুমি কেনো করছো?

বজলু স্যারের এই প্রশ্নের উত্তরে সোহান তার মায়ের মৃত্যুর কাহিনী সংক্ষেপে বর্ণনা করে, মৃত্যুর সময় তার মা যে, মৃত্যুকষ্টের কথা বলেছেন সেটিও বর্ণনা করে। তারপর ভীষণ উৎসাহ নিয়ে বলে,

- স্যার আপনি প্রাণিবিদ্যার শিক্ষক তাই আপনার কাছে আসলাম। আপনাকে বলতে হবে মৃত্যুকষ্ট কেনো হয়!

প্রফেসর সাহেব বেশ ফাঁপরে পড়েছেন বলে মনে হলো। সারাটা জীবন ধরে প্রাণিবিদ্যা পড়িয়েছেন এটা ঠিক কিন্তু এধরণের প্রশ্ন তার মাথায় কখনও আসেনি। তিনি উদোর পিন্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপানোর চেষ্টা করেন।

- আমার মনে হয় প্রশ্নটি প্রাণিবিদ্যার সাথে সম্পর্কিত নয়। এপ্রশ্নটার উত্তর বরং ইনিই ভাল জানবেন।

বলে পাশে বসে থাকা সমাজ বিজ্ঞানের প্রফেসরের দিকে হাত ইশারা করেন বজলু স্যার। সমাজ বিজ্ঞানের প্রফেসর প্রথমে কিছুটা ইতস্তত করলেও পরে প্রশ্নটি সহজভাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেন।

- দেখো মানুষ সামাজিক জীব। সমাজে আমরা একত্রে বসবাস করি। মা-বাবা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সবাইকে নিয়ে আমাদের সমাজ। এক জনের সাথে আরেকজনের কত গভীর সম্পর্ক! যখন কেউ মারা যায় এসব কিছু ছেড়ে চলে যায়।

প্রিয়জনদের ছেড়ে যেতে নিশ্চয় তার খুব কষ্ট হয়। এটাকেই মৃত্যুকষ্ট বলে।

সোহান বুঝতে পারে তার মায়ের ক্ষেত্রে এই ব্যাখ্যা প্রযোজ্য নয়। তার মা তো কেবল প্রিয়জনদের ছেড়ে যান নিবরং পরম প্রিয় জনের কাছে ফিরে গেছেন। যার সাক্ষাত পাওয়ার জন্য তিনি পঁচিশ বছর ধরে অপেক্ষা করেছেন। তাছাড়া প্রিয়জনদের ছেড়ে যাওয়ার কষ্ট মানসিক শারীরিক নয়। কিন্তু সোহান দেখেছে তার মা শারিরীকভাবে কষ্ট পাচ্ছিলেন। কষ্টে তার ঠোট-মুখ বাঁকা হয়ে গিয়েছিল। মোট-কথা, মৃত্যুকষ্ট সম্পর্কিত সামাজিক ব্যাখ্যাটি সোহানের পছন্দ হয় না। সে আপত্তি উত্থাপন করে বলে,

- আপনি যে ব্যাখ্যা দিলেন তাতে কষ্টটা হওয়া উচিৎ মানসিক। আমার যতদূর মনে হয়েছে আমার মা শারিরীকভাবে কষ্ট পাচ্ছিলেন মানসিকভাবে নয়।

সমাজ বিজ্ঞানের প্রফেসর কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন কিন্তু বাংলার প্রফেসর তাকে থামিয়ে বললেন,

- মৃত্যুকষ্ট বলে আসলে কিছু নেই। এসব গাঁজাখুরি কথা। মৃত্যু হলো ঘুম। চিরনিদ্রা। ঘুমোতে কি মানুষ কষ্ট পায়? ঐ কবিতাটি শোনেন নি,

ঘুমেয়েছে সখি মোর সুখেরও স্বপনে

উড়ে গেছে পাখি তার বনের গহনে

বাংলার প্রফেসরের কথা শুনে সোহানের খুব রাগ হয়। অন্যান্য প্রফেসররাও রেগে গিয়েছেন বলেই মনে হলো। তাদের সবাইকে একসাথে গাঁজাখোর উপাধি দেওয়ার কারণেতারা বেজায় রুষ্ট হয়েছেন। সমাজ বিজ্ঞানের প্রফেসর বললেন,

- এই সব কবিদের কথা বাদ দেন তো কবির সাহেব। মরে গেলে মানুষ ঘুমায় তা কি সে মরে গিয়ে দেখে এসেছে?

মুখ কাচুমাচু করে, কবির স্যার এবার বলেন,

- আপনারা তাহলে মৃত্যু কষ্টের কথা বলছেন কেনো? আপনারা কি মরে গিয়ে দেখে এসেছেন?

তার কথা শুনে সবাই চুপ হয়ে যায়। কেবল সোহান বলে,

- আমার মা নিজ মুখে বলেছেন, মৃত্যুর কষ্ট বড় কষ্ট!

সোহানের কথা শুনে সবাই উৎসাহ ফিরে পায়। তারা বাংলার প্রফেসরের দিকে তাকিয়ে থাকে কি বলে শোনার জন্য।

- দেখো তোমার মা হয়তো মিথ্যা বলেছেন।

কথা শুনে সোহান বেজায় রেগে যায়।

- দেখুন আমার মা ধার্মিক মানুষ। তাছাড়া মরার সময় একজন ব্যক্তি মিথ্যা বলবে কেনো?

কথাটি শুনে হালকা হেসে কবির স্যারবলে,

- মানুষ জন্মের সময় মিথ্যা কথা বলে আর মৃত্যুর সময় বলবে না!

মানুষ জন্মের সময় মিথ্যা কথা বলে শুনে উপস্থিত সবাই বিস্মিত হয়। বজলু স্যার বলেন,

- তুমি নিজেই দেখছি গাঁজাখুরি গল্প শুরু করেছো কবির। জন্মের সময় মানুষ কি কথা বলতে পারে যে মিথ্যা বলবে?

- মিথ্যা বলতে হলে যে কথা বলা লাগবে এমন নয়, স্যার। দেখুন স্যার আপনাকে একটা কথা বলি, আপনি কি ছেলেবেলায় ছোট ভায়ের সাথে মারামারি করেছেন?

বজলু স্যার বয়োজ্যেষ্ঠ মানুষ। ছেলেবেলার গোপন খবর সবার সামনে ফাঁস করে দেওয়ার ইচ্ছা তার ছিল না। তিনি মুখে বিরক্তি প্রকাশ করে বললেন,

- তা অল্প-স্বল্প করেছি বৈকি।

- আমরাও করেছি স্যার। কিন্তু ঘটনা কি জানেন? আমার আবার একটু মায়া-দয়া বেশি ছিল। ছোট ভাইকে খুব একটা জোরে মারতে পারতাম না। এই হয়তো মশা মারার মতো একটা চড় মেরেছি অমনি সে ভ্যাঁ করে এমন জোরে কেঁদে উঠতো যে বাবা মনে করতেন আমি তাকে মেরে লাশ করে ফেলেছি। শেষে কি মারটাই না আমাকে মারতেন। এখন বলুন স্যার এই অযথা ক্রন্দন কি মিথ্যা কথা হিসেবে গণ্য নয়?

বজলু স্যার জ্ঞানী মানুষ। কবির স্যারের যুক্তি তিনি বুঝতে পারেন। উপর থেকে নিচে বারকয়েক মাথা ঝাকিয়ে বলেন,

- তা বটে। কিন্তু আমাদের আলোচনার সাথে এটা কি প্রাসঙ্গিক হলো কবির?

- নিশ্চয় স্যার, নিশ্চয়। এই যে দেখুন বাচ্চা ছেলেগুলো জন্মের সময় কাঁদে। জন্ম কি কোনো দুঃখের বিষয় যে কাঁদতে হবে? এই শুভক্ষণে কাঁদা-কাটি করাটা কি মিথ্যা কথা নয়? এজন্যই আমি বলেছি, মানুষ জন্মের সময় মিথ্যা কথা বলে।

কথাটি বলে কবির স্যার বেশ বাহাদুরি ভাব দেখাতে থাকেন। অন্য প্রফেসররাও লা জওয়াব হয়ে যায়। বজলু স্যার কিছুক্ষণ চিন্তা করে নিয়ে বলেন,

- আমার মনে হয় তুমি ঘটনা বুঝতে পারো নি কবির। সন্তান জন্ম নেওয়াটা মা-

বাবার জন্য সুখের সংবাদ কিন্তু বাচ্চার জন্য মোটেও সুখের বিষয় নয়।

কবির স্যার যেনো আকাশ থেকে পড়লো,

- কেনো স্যার, কেনো?

- এই সহজ বিষয়টা তুমি বুঝলে না? তোমার অবশ্য না বুঝারই কথা। এটা প্রাণিবিদ্যার বিষয়। মায়ের পেটে বাচ্চা কি যত্নে থাকে তা কি জানো? একেবারে নাতিশীতোষ্ণ পরিবেশ। যাকে বলে ইয়ার কন্ডিশন। ঠাণ্ডা গরমের কোনো বালাই নেই। বসে বসে খাবার পায়, নাভির নাড়ি ধরে খেলা করে। যখন যেটা খুশি। বাঁধা দেওয়ার কেউ নেই। কিন্তু দুনিয়ায় আসার সাথে সাথের তার দুঃখ কষ্ট শুরু হয়ে যায়। এই নাড়ি কাটো, আগুনের সেক দাও, কাঁথা-কম্বল জড়াও। তার উপরে ঠান্ডা গরম আর বিভিন্ন রোগ বালাই তো রয়েছেই। এসব কারণেই তো সে কান্নাকাটি করে। সে মোটেও মিথ্যা বলে না বরং তোমরাই তার কথা বুঝতে পারো না।

এতক্ষণের যুক্তি-প্রমাণ সব ভেঁস্তে গেছে দেখে কবির স্যার নিরব হয়ে যায়। অন্যান্য শিক্ষকরাও বলার মতো কোনো কথা খুঁজে না পেয়ে চুপ হয় যায়। কেবল রায়হান সাহেব এবার মাথা উঁচু করেন। তিনি পদার্থ বিজ্ঞান পড়ান। তিনি এতক্ষণ বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করছিলেন। যে কোনো কিছু নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা-ফিকির করা তার অভ্যাস। তিনি বলতে শুরু করেন,

- আমার মনে হয় নিউটনের সূত্র অনুযায়ী বিষয়টির ব্যাখ্যা দেওয়া যায়। "প্রত্যেকটি ক্রিয়ার সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে"। যখন স্থির বস্তুকে সচল করা হয় তখন সে পিছনে একটা চাপ দেয় একারণে নৌকা থেকে লাফ দিলে নৌকা পিছনে সরে আসে। একইভাবে কোনো সচল বস্তুকে স্থির করা হলে সে বিপরীত দিকে চাপ প্রয়োগ করে। একারণে চলন্ত বাস হঠাৎ থেমে গেলে যাত্রীরা সামনের দিকে ঝাঁকুনি অনুভব করে। জীবনকে আমরা একটা গতিশীল বাসের সাথে তুলনা করতে পারি। মৃত্যুর সময় এটা হঠাৎ থেমে যায়। তাই একটা ঝাঁকুনি অনুভূত হওয়া খুবই স্বাভাবিক। এটাই হয়তো মৃত্যু কষ্ট।

রায়হান স্যারের কথা সবাই পছন্দ করেছে বলে মনে হলো। সবাই মাথা ঝাঁকিয়ে রায়হান স্যারের ঝাঁকুনি তত্ত্বকে সমর্থন করলেন। বজলু স্যার বললেন,

- দেখেছো তো কবির, মৃত্যু কিন্তু মোটেও সুখনিদ্রা নয় বরং একটা ঝাঁকুনি, অনেকটা ভূমিকম্পের মতো।

কবির স্যার মুখ গোমড়া করে বসে থাকেন। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে তার মন মগজে একটা ঝাঁকুনি চলছে। সোহানের কাছে কিন্তু এই ঝাঁকুনি তত্ত্ব সত্য বলে মনে হয় না। সাহিত্যের পরিভাষায় হয়তো জীবনকে চলন্ত বাসের সাথে তুলনা করা যায় কিন্তু

এর মাধ্যেম মৃত্যুকষ্টের ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব নয়। সোহান বুঝতে পারে মৃত্যু সম্পর্কে এরা সবাই তার মতোই অজ্ঞ। এদের কেউ মৃত্যুর সঠিক রূপরেখা সম্পর্কে জানে না। সবাই কে সালাম দিয়ে সে ফিরে আসে। তার মনে এখন একটাই চিন্তা,

- যে ভাবেই হোক মৃত্যুদূতের সাথে সাক্ষাত করতে হবে। তিনিই পারবেন সঠিক সমাধান দিতে।

কোথায় গেলে মৃত্যুদূতের খোঁজ পাওয়া যাবে সে সম্পর্কে স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে সোহানের বেশ কিছুক্ষণ সময় লেগে যায়। শেষ-মেষ তার মনে হয় সফদারপুর গেলে হয়তো তার সম্পর্কে কোনো তথ্য পাওয়া যাবে। পরিকল্পনাটি মাথায় আসার সাথে সাথেই সোহান ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে। তড়িঘড়ি করে সে মতিচুর রেল স্টেশনে চলে যায়। সেখান থেকে সফদারপুরগামী একটা ট্রেনে চেপে বসে। মতিচুর থেকে সফদারপুর খুব একটা দূরে নয়। আধা ঘন্টার রাস্তা। কিছুক্ষণ পরই ট্রেন সফদারপুর পৌঁছে যায়। ট্‍রেন থেকে নেমেই সোহান চারিদিকটায় একবার চোখ বুলিয়ে নেয়। পুরোপুরি গ্রাম্য এলাকা। স্টেশনটিকে ঘিরে কয়েকটি দোকানপাসারী গড়ে উঠেছেএই যা। এদিক-সেদিক দুএকজন ছেলে ঘুরে ঘুরে বাদাম বিক্রি করছে, এক কোনে একটি চায়ের দোকানে দশ পনের জন লোক নিরসভাবে চা পান করছে, কয়েকজন যাত্রী ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করছে। প্লাটফর্মের ঐ দিকটায় দু'একটা গরু ছাগল চরছে। সোহান সবকিছু খুটিয়ে-খুটিয়ে দেখতে থাকে যেনো সে আশা করছে এখানেই কোথাও ঘাপটি মেরে লুকিয়ে আছে মৃত্যুদূত নামের বৃদ্ধ লোকটি। কিন্তু তার সে আশা সঠিক প্রমাণিত হলো না। পাগলাটে চেহারার দু' একজন লোক এখানে ঘুর-ঘুর করছে বটে তবে মৃত্যুদূত এখানে নেই। হঠাৎ সোহানের ধারে-কাছে একজন বাদাম বিক্রেতা চিৎকার করে ওঠে,

- বাদাম খান জীবন বাঁচান।

সোহান তার দিকে হাত উঁচু করতেই সে ছোট পাল্লাটিতে বাদাম ভরতে ভরতে তার নিকট ছুটে আসে।

- কতটুকু দেবো স্যার?

সোহান হাত নেড়ে অসম্মতি জানায়।

- বাদাম লাগবে না, আমার একটা খবর দরকার।

কথাটি শুনে ছেলেটি চেহারায় অসন্তোষ ফুটে উঠলেও সৌজন্যতার খাতিরে সে তা প্রকাশ করলো না। মুচকি হাসার ভান করে বললো,

- কি খবর স্যার, বলুন।

- দেখো আমি এক লোককে খুঁজছি তার নাম 'মৃত্যুদূত'।

মৃত্যুদূত নামটি শুনে ছেলেটির মুখে বিশ্ময় ফুটে উঠলো। হাসতে হাসতে বললো,

- এই নামের কোনো মানুষকে আমি চিনি না তবে অন্য জিনিস আছে।

ছেলেটির কথা শুনে সোহানের মনে আশার বাতি জ্বলে ওঠে। মানুষ হোক জিন হোক একটা হলেই হবে এমন ভাব দেখিয়ে বলে,

- কোথায় সে?

- এই তো।

বলে পাশে অপেক্ষমান ট্রেনের দিকে ইশারা করে ছেলেটি। সোহান সেদিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে। তারপর আবার দৃষ্টি দেয় বাদাম বিক্রেতার দিকে। যেনো সে কিছুই বুঝতে পারছে না। সোহানকে অবাক হতে দেখে ছেলেটি হেসে বলে,

- এর নামই হওয়া উচিৎ মৃত্যুদূত। এর চাকার নিচে কত লোকের প্রাণ নাশ হয়েছে তার কি হিসাব-নিকাশ আছে?

তখনি ট্রেনের হুইসেল বেজে ওঠে। ঝকঝক করে সোহানদের পাশ কাটিয়ে চলে যায় ওটা। বাদাম বিক্রেতাও সোহানের দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে হাটতে থাকে। সোহান কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে তার দিকে। তারপর আবার সতর্ক দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করতে থাকে চারপাশটা। একসময় তার দৃষ্টি পড়ে চায়ের দোকানদারের উপর। প্রায় পঞ্চাশ বছর বয়সের বৃদ্ধ। সোহান তাকে চিনতে পারে। সম্ভবত সোহানের জন্মের আগে থেকেই চা বিক্রি করে এই বৃদ্ধ। সোহান যতবারই ট্রেনে চড়ে কোথাও গিয়েছে এই বৃদ্ধ লোকটিকে এখানে দাঁড়িয়ে চা বিক্রি করতে দেখেছে। সোহানের মনে পড়ে মৃত্যুদূত ট্রেন থেকে নেমে এই বৃদ্ধের সাথে মিনিট কয়েক আলাপ করেছিল তারপর পাশের গলিটি ধরে অন্ধকারে হারিয়ে গিয়েছিল। সোহানের মনে হয় এই বৃদ্ধের সাথে কথা বললে কোনো প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়া যেতে পারে। যেই ভাবা সেই কাজ। সোহান দ্রুত গিয়ে হাজির হয় বৃদ্ধ চা বিক্রেতার নিকট। তাকে সালাম দিয়ে বলে,

- আপনি কি মৃত্যুদূত নামে এক বৃদ্ধকে চেনেন?

এতটুকু বলতেই পাশ থেকে একজন চিৎকার করে বলে,

- এই যে, চাচা, আমার চা কোথায়?

- দিচ্ছি বাবা দিচ্ছি।

বলে লোকটি এককাপ চায়ের মধ্যে একটি ছোট চামচ জোরে জোরে ঘুরাতে থাকেন। প্রশ্নের উত্তরের পরিবর্তে সোহানের কানে আসে চামচ আর গ্লাসের টুং টাং শব্দ। সোহান বুঝতে পারে এই ব্যস্ততার মধ্যে এই বৃদ্ধের সাথে কথা বলে লাভ নেই। সে একটু দূরে দাড়িয়ে বৃদ্ধের অবসরের অপেক্ষা করতে থাকে। কিন্তু চায়ের দোকনটি

ক্রমে জনাকীর্ণ হয়ে উঠছে আর তার সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে বৃদ্ধের ব্যস্ততা। এভাবে কতক্ষণ অতিবাহিত হয়েছিল সোহান জানে না। বৃদ্ধটির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকে সোহানের দুটি চোখ ক্লান্ত হয়ে উঠেছিল। সে কিছুক্ষণের জন্য চোখ বুজে ছিল। হঠাৎ চোখ খুলে তার নজরে পড়ল, বৃদ্ধ যে স্থানে দাড়িয়ে চা বানাচ্ছিল সেখানে এখন একটা বার তের বছরের ছেলে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সোহান বুঝতে পারলো চা ওয়ালা বৃদ্ধের এখন অবসর হয়েছে। কিন্তু তিনি কোথায়? বৃদ্ধের খোঁজে চারিদিকে চোখ বুলিয়ে কোথাও তাকে পাওয়া গেলো না। কিছুক্ষণ পরই হয়তো বৃদ্ধ আবার চা বানাতে লেগে যাবে ভেবেই সোহানের বুকটা দুরু দুরু করে উঠলো। সে ব্যতিব্যস্ত হয়ে ছোট ছেলেটাকে প্রশ্ন করলো,

- তোমার আব্বু কোথায় গেল?

ছেলেটি মুখ কালো করে বলল,

- উনি আমার দাদা।

- দাদা হোক আর চাচা হোক উনি গেলেন কোথায়?

- উনি এই মাত্র বাড়ির দিকে রওয়ানা হয়েছেন দুপুরের নাওয়া-খওয়া সেরে আবার তিনটের দিকে আসবেন।

সোহান মুখ ভেংচিয়ে বিরক্তি প্রকাশ করে বলে,

- এতক্ষণ ধরে উনার সাথে কথা বলবো বলে অপেক্ষা করছি!

- তাহলে এই রাস্তা ধরে এগিয়ে যান। উনি বোধ হয় বেশিদূর যান নি।

আর কথা না বাড়িয়ে সোহান পাশের গলি রাস্তাটি ধরে দ্রুত পায়ে এগিয়ে যায়। লোকটি সত্যিই বেশিদূর যেতে পারেন নি। বৃদ্ধ বয়সে আর কত জোরেই বা হাটবেন! সোহান দ্রুত পায়ে সামান্য একটু এগিয়ে যেতেই লোকটিকে পেয়ে গেলো। তার কাছাকাছি হয়ে সালাম দিয়ে বলল,

- আপনার সাথে আমার কিছু কথা আছে। আমি অনেক্ষণ ধরে আপনার জন্য অপেক্ষা করছি। আমি আপনার কাছে একটা কথা জানতে চাই।

লোকটি সোহানের দিকে তাকিয়ে তাকে চিনতে পারলেন। সে যে একবার তার সাথে কিছু একটা বলতে চেয়েছিল সেটাও তার মনে পড়ল। তিনি একটু সামনে গিয়ে একটা গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে বললেন,

- কি জানতে চাও বলো।

সোহান বুঝতে পারে, এই ব্যক্তিকে সে এখন যে প্রশ্নটি করবে তা সহজ কোনো প্রশ্ন

নয়। প্রায় পাঁচ সাত বছর আগে ঘটে যাওয়া একটা ঘটনা এই বৃদ্ধ লোকটির স্মৃতি থেকে বের করে আনা সহজ নয়। একটু সংযত হয়ে সে বলে,

- ঘটনাটি অনেক আগের। আমি বলবো আর আপনি মনে করার চেষ্টা করবেন।

বৃদ্ধ লোকটি মাথা নেড়ে সম্মতি প্রদান করে। সোহানের মনে হয় লোকটি এ বিষয়ে কৌতুহলী হয়ে উঠেছে। সে বলতে থাকে,

- প্রায় পাঁচ সাত বছর আগে একদিন রাতের বেলা। একজন বৃদ্ধ লোক আপনার কাছে এসেছিল। আপনাদের এলাকার কোনো একজন ব্যক্তি তখন মৃত্যুশয্যায় ছিল। ঐ লোকটি তাকে দেখতে এসেছিল।

এতটকু বলে সোহান বৃদ্ধ লোকটির দিকে তাকিয়ে থাকে। লোকটির চেহারা দেখে বোঝা যাচ্ছে তিনি স্মৃতির রাজ্যে মন্থন করছেন। চোখ বুজে বেশ কিছুক্ষণ অনুসন্ধান করার পর মাথা নেড়ে বললেন,

- দৈনিক কত লোকই তো আমার সাথে কথা বলে। তাদের সবাইকে কি মনে রাখা যায়?

সোহান হাল ছাড়ে না। মাথা ঠান্ডা করে সে আবার বলে,

- দয়া করে ভাল ভাবে মনে করার চেষ্টা করুন। বিষয়টি খুব জরুরী। লোকটি ছিল কিছুটা পাগলাটে ধরণের। আজব প্রকৃতির। সে মরা মানুষ নিয়ে গবেষণা করে। মরা মানুষকে বিভন্ন রকম প্রশ্ন করে।

- হ্যাঁ হ্যাঁ মনে পড়েছে। পাঁচ সাত বছর আগেই হবে। একটা পাগল এসেছিল আমাদের গ্রামে। সমির মোল্লাকে দেখতে। বেচারাকে শান্তিতে মরতেও দেয় নি পাগলটা। একেবারে মরার উপর খাড়ার ঘা।

বহু চেষ্টা-প্রচেষ্টার পর কোনো মুল্যবান জিনিস পাওয়া গেলে মানুষ যেমন খুশি হয় সোহানের সেরকম অবস্থা হয়। আরো বেশি নিশ্চিত হওয়ার জন্য সে বলে,

- শান্তিতে মরতেও দেয় নি? কেনো কি করেছিলো লোকটা?

- কি উদ্ভট লোকরে বাবা। একটা লোক মৃত্যুযন্ত্রনায় কাতরাচ্ছে আর তাকে কিনা হাজার রকমের প্রশ্ন। তোমার এখন কেমন লাগছে? ছেলে-পুলেদের কথা মনে পড়ছে? এই সব।

সোহান হালকাভাবে হেসে ওঠে। লোকটি উৎসাহিত হয়ে বলে,

- আরো আছে, মরা মানুষটার চোখের সামনে হাত নেড়ে বলছিল, বলো তো দেখি কটা আঙ্গুল দেখা যাচ্ছে? কি অবাক কাণ্ড বলো তো!

সোহান এবার নিশ্চিত বুঝতে পারে ঐ লোক মৃত্যুদূত ছাড়া আর কেউ নয়। সে অনুনয় করে বলে, ঐ পাগলটার ঠিকানা বলতে পারবেন আপনি?

- না বাবা। আমি কিভাবে তার ঠিকানা বলবো!

বৃদ্ধের এই কথাটি শুনে সোহানের মন আবার হতাশাগ্রস্ত হয়ে গেলো। মন খারাপ করা কণ্ঠে বলল,

- কোনোভাবে তার ঠিকানাটা কি সংগ্রহ করা যায়? আমার খুব দরকার!

লোকটা খুব অবাক হয়ে সোহানের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে। যেনো চিন্তা করছে ঐ পাগলটার কাছে এই ভদ্রলোকের কি দরকার!

- সানোয়ার হয়তো লোকটার ঠিকানা বলতে পারবে।

- সানোয়ার আবার কে?

- ঐ পাগলটার ইয়ার বন্ধু হবে হয়তো। সেদিন রাতে তো সে তার বাড়িতেই ছিল।

- ও তাই নাকি? তাহলে এই সানোয়ার মিঞার বাড়িটা কোথায়!

- চলো আমিই তোমাকে দেখিয়ে দিচ্ছি। আমার বাড়ি যাওয়ার পথেই তার বাড়িটা পড়বে।

বলেই লোকটি হাটতে শুরু করলো। সোহান খুশি মনে তার পিছু পিছু হাটতে থাকলো।

রাস্তার মধ্যে বৃদ্ধ লোকটিকে আর কোনো প্রশ্ন করলো না সোহান। সে এখন সানোয়ার নামের এই লোকটি সম্পর্কে চিন্তা করছে। তার সাথে কিভাবে কথা বলা যায় সেটা আগে থেকেই ভেবে নিচ্ছিলো সে। তার মনে তখন একটাই চিন্তা, ঐ লোকটি কি মৃত্যুদূতের ঠিকানা বলতে পারবে? এরই মধ্যে বৃদ্ধের কথা শোনা যায়।

- এই তো সানোয়ারের বাসা।

বলেই বৃদ্ধ লোকটি ডাকা-ডাকি শুরু করলো,

- সানু এই সানু বাড়ি আছিস নাকি?

কিছুক্ষণ হাঁক ডাক করার পর বাড়ির ভিতর থেকে আওয়াজ শোনা গেলো।

- কে? হবি নাকি?

বলতে বলতে রুগ্ন একটি বৃদ্ধ লোক বাড়ি থেকে বের হয়ে আসলো।

- অমন হৈ চৈ করে ডাকছিস কেনো? কি হয়েছে?

- এই ছেলেটা তোর সাথে কথা বলবে বলছে, দেখ কি বলে।

কথাটি বলেই সামনের দিকে হাটতে থাকে বৃদ্ধ চা বিক্রেতা। তার মাথায় এখন একটিই চিন্তা। যত দ্রুত সম্ভব বাড়ি যেয়ে নাওয়া খাওয়া শেষ করে দোকানে ফিরে যাওয়া। লোকটির চলে যাওয়ার পথের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে সোহান দৃষ্টি ফেরায় সানোয়ার নামের লোকটির দিকে। কিভাবে কথা শুরু করবে বুঝতে পারে না সে। কিছুক্ষণ ইতস্তত করে বলে,

- আপনিই তাহলে মিষ্টার সানোয়ার?

কথাটি শুনে লোকটি বেশ খানিকটা নাখোশ হয়েছে বলে মনে হলো। স্পষ্টভাবে বিরক্তি প্রকাশ করে বলল,

- না বাপু, আমি মাস্টার নই। মাস্টার–ফাস্টার আমি দুচোখে দেখতে পারি না। সারাটা দিন নাবালেগ ছেলেদের মাথার উপর ছড়ি ঘুরানো খুব একটা ভাল কাজ নয়। বুঝেছো?

সোহান লোকটির কথার আগা-মাথা কিচ্ছু বুঝতে পারে না তবু বুঝার ভান করে। বেশ জোরে মাথা নাড়াতে নাড়াতে বলে,

- জী হ্যাঁ। বুঝতে পেরেছি।

এরপর কিছুক্ষণ চুপ থেকে আবার বলে,

- ইয়ে, মানে আমি আপনার কাছে এসেছিলাম আপনার এক বন্ধুর খোঁজে।

- আমার বন্ধু?

লোকটি এমন ভাবে কথা বলে যেনো কোনো কালে তার কোনো বন্ধু ছিল না। থাকার কথাও না।

- জী হ্যাঁ। অনেকটা পাগলাটে ধরনের একটা বৃদ্ধ লোক... ।

এবার লোকটি আগের চেয়ে বেশি রেগে গেলো।

- পাগল? আমি পাগল লোকের সাথে বন্ধুত্ব করতে যাবো কেনো? পাগলের বন্ধু হয় পাগল। আমাকে দেখে কি পাগল মনে হয়?

সোহান লোকটির দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে। তাকে দেখে পাগলই মনে হচ্ছে কিন্তু এই সত্য কথা কি সব সময় বলা যায়? সে একটু ভিন্নভাবে মৃত্যুদূতের পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করে।

- সত্তর পঁচাত্তর বছর বয়সের একজন বৃদ্ধ লোক। মরা মানুষের খোঁজ খবর করে বেড়ায়। সবাই তাকে মৃত্যুদূত বলে ডাকে।

এতটুকু বলে সোহান লোকটির মুখের দিকে তাকিয়ে তার মনের ভাব বুঝার চেষ্টা করে। লোকটি কিছুক্ষণ নিরব থাকে। বোঝা যাচ্ছে তিনি চিনতে পেরেছেন কিন্তু স্বীকার করতে চাচ্ছেন না। পাগল টাইপের লোকের সাথে তার যে আসলেই বন্ধুত্ব আছে সেটা প্রমাণিত হতে দেখে তিনি কিছুটা সংকুচিত হয়েছেন মনে হয়। সোহান আবার বলে,

- লোকটি খুবই বুদ্ধিমান। পণ্ডিত মানুষ। বিভিন্ন জটিল প্রশ্নাদির উত্তর দিয়ে থাকেন। তিনি এমন কি মরা মানুষকেও প্রশ্ন করেন।

- হ্যাঁ-হ্যাঁ চিনতে পেরেছি। কিন্তু তার সাথে তোমার কি কাজ?

- আমি তার কাছে একটা প্রশ্ন করতে চাই। আপনি কি তার ঠিকানাটা আমাকে একটু দেবেন?

প্রশ্নের কথা শুনে লোকটার মনে কিছুটা কৌতুহল সৃষ্টি হয়েছে বলে মনে হলো। মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল,

- কি প্রশ্ন? আমাকে বলোতো দেখি উত্তর দিতে পারি কিনা। আমিও কিন্তু ভালই পণ্ডিত!

এই লোকটিকে কোনো প্রশ্ন করার ইচ্ছা সোহানের ছিল না। কিন্তু লোকটি প্রশ্নটি শুনতে চাচ্ছে, না বললে যদি রেগে যায় এই ভেবে সোহান প্রশ্নটি তাকে শোনায়,

- আমি মৃত্যুযন্ত্রণা সম্পর্কে জানতে চাই। আমি জানতে চাই মৃত্যুযন্ত্রনা কেনো হয়?

প্রশ্নটি শুনে লোকটির মুখ শুকিয়ে যায়। সে বুঝতে পারে এ প্রশ্নের ভুল কিংবা সঠিক কোনো উত্তরই তার জানা নেই। তিনি বরং মৃত্যুদূতের ঠিকানাটিই বলতে শুরু করেন,

- তার বাড়ি সোনাডাঙা।

সোহানের মনে পড়ে সোনাডাঙা গ্রামের নাম সে এর আগে শুনেছে কিন্তু সেখানে কিভাবে যেতে হয় তা সে জানে না। সে বিনয়ের স্বরে বলে,

- সোনাডাঙা যাবো কিভাবে?

- এখান থেকে সরাসরি চলে যাও রেল স্টেশনে। সেখান থেকে ট্রেনে চেপে চলে যাবে ঘোড়াশাল। ঘোড়াশাল থেকে একটা ভ্যান বা রিকশা নিয়ে সোনাডাঙা চলে যাবে। খুব সহজ রাস্তা, বুঝলে?

- জী হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি। খুব ভালই বুঝতে পেরেছি।

সত্যি বলতে কি সানোয়ার মিঞার অন্য কথাগুলোর মাথা-মুন্ডু কিছুই খুঁজে না পেলেও তার এই কথাটি ভাল মতো বুঝতে পেরেছে সোহান। আসলে তার দরকারও ছিল

কেবল এই তথ্যটির। সুতরাং অধিক বাক্যালাপে সময় ক্ষেপণ না করে সে তৎক্ষনাৎ সানোয়ার মিঞার নিকট বিদায় নিয়ে সোনাডাঙা অভিমুখে রওয়ানা হয়ে যায়।

সানোয়ার মিঞার নির্দেশনা অনুযায়ী প্রথমে ট্রেন এবং পরে রিকশা যোগে সোনাডাঙা পর্যন্ত তো সহজে পৌঁছানো গেলোকিন্তু তার পর গোলমাল বেঁধে গেলো। এই মুহূর্তে সোহান বুঝতে পারলো কারো ঠিকানার মধ্যে তার আসল নামটি কত গুরুত্বপূর্ণ। রিকশা ওয়ালা সোহানকে যেখানে নামিয়ে দিল সেখানে দু' চারটি বাচ্চা ছেলে খেলা করছিল। তাদের একজনের দিকে হাত ইশারা করে সোহান বলল,

- এই খোকা এদিকে এসো তো।

ছেলেটি ধীর পায়ে সোহানের দিকে এগিয়ে আসলো। অন্য ছেলেরা খেলা থামিয়ে একটু দূর থেকে কৌতুহলের দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলো। ছেলেটি কাছে আসতেই সোহান বলল,

- তোমাদের এখানে কি মৃত্যুদূত নামে কেউ থাকে?

মৃত্যুদূত নামটি শুনে যেনো ছেলেটি চমকে উঠলো। বেশ জোরে জোরে মাথা নেড়ে বলল,

- না-না এ নামে কেউ এ গ্রামে থাকে না।

সোহান তাকে ছেড়ে দিয়ে সামনের দিকে রওয়ানা হলো। কিছুক্ষণ হাটার পর সোহানের মনে হয় তার পিছু পিছু কেউ হেটে আসছে। পিছনে তাকিয়ে সে দেখলো সবগুলো ছেলে খেলা থামিয়ে সোহানের পিছু নিয়েছে। তারা ভীষণ আগ্রহ নিয়ে নিজেদের মধ্যে ফিস ফিস করে আলোচনা করছে।

- এই লোকটা কে?

- ইনি মরা মানুষ খুঁজে বেড়াচ্ছেন।

- ওরে বাবা। তাই নাকি! দেখিস আজকে আমাদের গ্রামে কেউ একজন মারা যাবে।

এসব আলোচনা শুনে সোহান হাসবে কি কাঁদবে বুঝে উঠতে পারে না। আরো কিছুদূর হেটে গিয়ে সোহানের নজরে পড়ে একটি চায়ের দোকান। দশ পনের জন লোক সেখানে বসে গল্পগুজব করছে। সোহানকে আসতে দেখে তারা সবাই তার দিকে দৃষ্টি ফেরায়। সোহান সেদিকে এগিয়ে গিয়ে সালাম দিয়ে বলে,

- আপনাদের এলাকায় কি কোনো বৃদ্ধ মানুষ আছে?

প্রশ্নটি শুনে লোকগুলো একে অপরের দিকে তাকালো। পাশ থেকে একজন বলল,

বৃদ্ধ লোক তো বাবা কতোই আছে। এই যে আমার মতি ভাই রয়েছে দেখো তো

পছন্দ হয় কিনা।

সোহান বুঝতে পারে বেশ বোকামি হয়েছে। মতি নামের বৃদ্ধলোকটির দিকে চোখবুলিয়ে নিয়ে বলে,

- না উনি নয়। লোকটা পাগলাটে ধরনের।

সবগুলো লোক এবার এক সাথে শব্দ করে হেসে ওঠে। একজন হাসি থামিয়ে বলে,

- না বাবা আমাদের গ্রামে কোনো পাগল-টাগল নেই। একজন অবশ্য আছে তবে সে বৃদ্ধ নয়, ছোঁকড়া।

তার কথাটি শেষ হলে লোকজন আবার হাসতে থাকে। সোহানের মনে হয় আসলে এই গ্রামের সবাই পাগল তাই তারা ভাবছে এখানে কোনো পাগল নেই। সে হতাশভাবে সামনে এগিয়ে যেতে থাকে। বাচ্চা ছেলেগুলো আবারও তার পিছু নেয়।

এভাবে এদিক-সেদিক হাঁটাহাঁটি করতে করতে ক্লান্ত হয়ে যায় সোহান। কয়েকবার তার মনে হয়েছিল বাড়ি ফিরে যায়। কিন্তু এত কষ্ট করে এতদূর এসে মৃত্যুদূতের সাথে সাক্ষাত না করে বাড়ি ফিরে যাওয়া অনুচিত ভেবে সে আবার হাঁটতে শুরু করে। পুরোপুরি হতাশ হয়ে যাওয়ার ঠিক আগ মুহূর্তে পিছন থেকে কারো ডাক শোনা যায়।

- এই যে এই ছেলে।

সোহান পিছনে ফিরে দেখে বেশ খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে এক বৃদ্ধ তাকে ডাকছেন। কাছে গিয়ে লোকটিকে চিনতে পারে। এই লোকটির খোঁজেই আজ সারাটা দিন কাবার হয়েছে তার। পাঁচ সাত বছরে তার চেহারা একটুও বদলায়নি। তাড়াহুড়া করে সালাম দিয়ে সোহান বলে,

- আপনার খোঁজে আজ আমার বারোটা বেজে গিয়েছে।

- তুমি পাগল হয়ছো? এখন পুরো চারটা বাজে।

সোহান ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখে সত্যি সত্যিই চারটা বাজে। কিছু বেশি বৈ কম নয়। আর সাথে সাথেই তার পেটের ভিতর প্রচণ্ড খিদে মোচড় দিয়ে ওঠে। তার উপর মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে যাওয়ার চিন্তা।

- আমি আপনার কাছে একটা প্রশ্ন করতে চায়। অনেক দূর থেকে শুধু এই প্রশ্নটি করার জন্য এসেছি।

- ওসব পরে হবে। আগে বাড়ি চলো দুটো ডাল ভাত খাবে।

বলে সোহানের হাত ধরে তর তর করে বাড়ির দিকে টেনে নিয়ে যায় মৃত্যুদূত।

সোহানকে নিয়ে তিনি যে বাড়িটিতে প্রবেশ করলেন সেটা একটা পুরোনো জমিদার বাড়ি। সোহান মনে মনে ভাবে, এই লোকটির পূর্বপুরুষরা কি জমিদার ছিল!

- তুমি এখানটায় বসো, আমি তোমার জন্য খাবার নিয়ে আসি।

কথাটি বলে দ্রুত পায়ে বের হয়ে গেলো বৃদ্ধলোকটি। সোহান ঘরটাকে ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করে। একটি খাট যার উপর এখন সে বসে রয়েছে। এক কোনে একটি টেবিল। ছোট একটা বাঁশের আলমারী। তাতে দু' চারটি বই আর নানা রঙের কাগুজে ফাইল। বইগুলো সব মৃত্যু সম্পর্কে লেখা। মৃত্যুর পর, মৃত্যুর ওপার এই প্রকৃতির। ফাইলগুলোতে কি আছে বোঝা যাচ্ছে না। এর মধ্যে ফিরে আসেন মৃত্যুদূত নামের লোকটি। সাথে করে তিনি যে খাবার নিয়ে এসেছেন সেটাকে ডাল ভাত না বলে চাল ভাত বলাই শ্রেয়। আসিদ্ধ বা আধা সিদ্ধ চালগুলো সোহান কিছুতেই ভাল মত চিবাতে না পেরে শেষ-মেষ গিলে খাওয়া শুরু করে। খেতে খেতে বলে,

- আপনি কিভাবে বুঝলেন আমি আপনাকেই খুঁজছি?

- শুনলাম একজন ভীনদেশী পাগলাটে ধরনের একটা বৃদ্ধ মানুষের খোঁজ করছে। ভাবলাম, এই গ্রামে পাগল থাকতে হলে তো আছি কেবল আমি। তাই ...

সোহান ভাবে, যে নিজেকে পাগল বলে সে কখনও পাগল নয়, সে মহৎ। এই ব্যক্তিকে এতক্ষণ পাগল হিসেবে পরিচয় দেওয়ার কারণে সে ভীষণ সংকোচ বোধ করে। প্রসঙ্গ পরিবর্তন করার জন্য বলে,

- আপনার হাতের রান্না তো ভীষণ সুন্দর!

মুখের সামনে এরকম ভূয়সী প্রশংসা শুনে বৃদ্ধ লোকটি অবলীলায় হেঁসে ওঠেন। কিছুক্ষণ পরই তার মুখের হাসি মিলিয়ে যায়। কৌতুহলী হয়ে বলেন,

- রান্না যে আমি নিজে হাতে করেছি সেটা তুমি কিভাবে বুঝলে?

- এ তো সহজ ব্যাপার, কোনো মেয়ে মানুষের রান্না কী এতো খারাপ হয়!

কথাটি বলেই সোহান বুঝতে পারে মারাত্মক ত্রুটি হয়ে গেছে। সে আবার প্রসঙ্গ পরিবর্তন করার চেষ্টা করে।

- আপনার গবেষণা কেমন চলছে?

- তা চলছে এক রকম।

বলে বাঁশের আলমারীটির দিকে ইশারা করে লোকটি। সোহানও সেদিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে। সে এখনও বুঝতে পারে না মৃত্যু সম্পর্কে গবেষণার সাথে এই আলমারীটির ঠিক কি সম্পর্ক। দ্রুত খাওয়া-দাওয়া শেষ করে সে আলমারীটির দিকে

এগিয়ে যায়। কিছুক্ষণ এটা-সেটা নিয়ে নাড়া-চাড়া করে বলে,

- এই ফাইলগুলো কিসের?

মৃত্যুদূত এতক্ষণ তার দিকেই চেয়ে ছিলেন। প্রশ্ন শুনে হালকা হেঁসে বললেন,

- ওগুলোই তো আমার গবেষণা।

- আমি কি একটু দেখতে পারি?

- হ্যাঁ নিশ্চয়।

অনুমতি পেয়ে সোহান একটি ফাইল হাতে তুলে নেয়। সেটার ভিতরে দেখা যায় কিছু হাতে লেখা কাগজ আর কিছু পেপার কাটিং। নানা জনের মৃত্যুর কাহিনী। একের পর এক সবগুলো ফাইল খুলে একই দৃশ্য দেখা গেলো। সোহান বুঝতে পারে এসবই বাস্তব কাহিনী যার কিছু অংশ মৃত্যুদূত নিজে খোঁজ খবর করে জেনেছে তাই নিজে হাতে লিখে রেখেছে আর কিছু অংশ বিভিন্ন পেপার থেকে সংগ্রহ করে রেখেছে। তার মনে হলো এই কাহিনীগুলো একত্রিত করে বিশ্বের সর্বাপেক্ষা বড় উপন্যাস লেখা যায়। সোহানের মনে পড়ল, তাকে দ্রুত বাড়ি ফিরতে হবে। তাড়াহুড়ো করে সে ফাইলগুলো গুছিয়ে রেখে মৃত্যুদূতের দিকে চেয়ে বলল,

- আপনার কাছে আমার একটা প্রশ্ন আছে। খুব জরুরী প্রশ্ন।

মৃত্যুদূত কোনো কথা বলল না। কেবল মুখ নেড়ে সম্মতি জানালো।

- মৃত্যুর যন্ত্রনা কেনো হয়?

প্রশ্নটি বলে, বৃদ্ধের মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে সোহান। তিনি কিছুক্ষণ নিরব থাকেন। তবে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে তিনি উত্তর দেবেন। মনে মনে তিনি এই জটিল বিষয়টি সহজে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করছেন।

- তুমি কি কখনও মৃত মানুষ দেখেছো?

সোহান হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়ে। আর কয়েকদিন আগে প্রশ্নটি করলে তাকে না বলতে হতো। মায়ের মৃত্যুর আগে কোনো মৃত মানুষকে সে দেখেনি।

- বলো তো, মৃত মানুষের সাথে জীবিত মানুষের কি পার্থক্য?

সোহান অনুমান করার চেষ্টা করে। তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে তার মায়ের মৃত দেহটা।

- এই যেমন ধরুন, মৃত মানুষ নড়া-চড়া করে না .....।

কিছুটা বিরক্তি প্রকাশ করে মৃত্যুদূত বলেন,

- এটা আবার বড় কোনো পার্থক্য হলো? না নড়লেই কি কেউ মৃত হয়ে যায়? আমি তোমাকে সহজে বিষয়টা বুঝিয়ে দিচ্ছি। এই যে আমার দিকে তাকাও।

সোহান অপলক তাকিয়ে থাকে বৃদ্ধ মানুষটির দিকে। সে লক্ষ্য করে লোকটি একেবারে স্থির বসে রয়েছে নিশ্বাস পর্যন্ত নিচ্ছে না। চোখের পলকও পড়ছে না। এভাবে কিছুক্ষণ থাকার পর তিনি আবার কথা বলতে শুরু করেন,

- একটু আগে আমি যে কিছুক্ষণ স্থির ছিলাম, নড়া-চড়া করছিলাম না। আমি তখন মৃত ছিলাম না জীবিত ছিলাম?

প্রশ্নটি শুনে সোহান একটু ভেবা-চেকা খেয়ে যায়।

- আমি কিভাবে জানবো আপনি মৃত ছিলেন কি জীবিত ছিলেন!

এধরনের উত্তর শুনে বৃদ্ধ লোকটির রেগে যাওয়া উচিৎ ছিল কিন্তু তিনি রাগলেন না। শুধু একটু বিরক্ত হয়ে বললেন,

- ঠিক আছে তোমাকে একটু অন্যভাবে বোঝায়। এবার তুমি আমার মতো স্থির হয়ে বসো। নিশ্বাস নেবে না। চোখের পলক ফেলবে না। ঠিক আছে?

- ঠিক আছে।

কথাটি বলে সোহান একটু আগেই মৃত্যুদূতকে যেভাবে স্থির বসে থাকতে দেখেছিল সেভাবে বসে থাকে। কিছুক্ষণ পর তার দম বন্ধ হয়ে আসে। সে হুস হুস করে নিশ্বাস নিতে থাকে। তার দিকে তাকিয়ে মৃত্যুদূত বলেন,

- এবার বলো, এই যে তুমি কিছুক্ষণ ঠাই বসে ছিলে, নড়া-চড়া করো নি। তুমি কি তখন মৃত ছিলে না জীবিত?

সোহান এবার প্রশ্নটি বুঝতে পারে।

- জীবিত, আমি জীবিত ছিলাম।

মুখে হাসি ফুটিয়ে মৃত্যুদূত বলেন,

- তাহলে কি বুঝা গেলো? নড়া-চড়া না করলেই কেউ মৃত হয়ে যায় তা নয়। বুঝতে পেরেছো?

সোহান মাথা নাড়ে। এখন সে বুঝতে পেরেছে।

- তাহলে এবার বলো, মৃত আর জীবিতের মধ্যে পার্থক্য কি?

সোহান এ প্রশ্নের কোনো উত্তর দিতে পারে না। সে কেবল অবুঝ ছাত্রের মতো মৃত্যুদূতের দিকে তাকিয়ে থাকে। তার অবস্থা অনুধাবন করে মৃত্যুদূত বলতে থাকেন,

- পার্থক্য হলো রুহ্। যাকে আমরা বলি আত্মাবা প্রাণ। যার মধ্যে রুহ আছে সে জীবিত। নড়া-চড়া করুক বা না করুক। আর যার মধ্যে রুহ নেইসে মৃত।

সোহান বিষয়টি স্পষ্ট বুঝতে পারে তার কাছে মনে হয় বিষয়টি পানির মতো সোজা। এরই মধ্যে আবার মৃত্যুদূতের কন্ঠ শোনা যায়।

- এবার বলো মৃত্যু কি?

সোহান আবার অথৈ সাগরে পড়ে যায়। সে কিছুই বলতে পারে না। মৃত্যুদূত আরেকটু বুঝিয়ে বলেন,

- দেখো তুমি একজন জীবিত মানুষ কারণ তোমার মধ্যে রুহ আছে। যখন তোমার মধ্যে রুহ থাকবে না তখন তোমার মৃত্যু হবে। তাহলে মৃত্যু অর্থ দেহ থেকে রুহ বিচ্ছিন্ন হওয়া। তাই না?

সোহান মাথা নাড়ে। সে এ কথাটিও বুঝতে পেরেছে। কিন্তু তার প্রশ্নের সাথে এগুলোর কি সম্পর্ক তা সে এখনও ধরতে পারে না।

- এখন আমরা অন্য একটা বিষয় নিয়ে চিন্তা করবো। জীবিত অবস্থায় আমাদের দেহে রুহ থাকে। তাহলে রুহ আমাদের দেহের একটা অংশ বা অংগ। কি ঠিক আছে?

- জী হ্যাঁ পুরোপুরি ঠিক আছে।

- মৃত্যুর সময় সেই অংগটি শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়। তাই না?

সোহান মাথা নাড়ে। একেবারে সঠিক কথা। মৃত্যুদূত হালকা হেসে উঠে বলেন,

- তোমার শরীরের কোনো অংগ দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার সময় তুমি কি কষ্ট পাও? এই যেমন ধরো দুজন লোক তোমার দুটি হাত ধরে টেনে হেঁচড়ে তোমার দেহ থেকে হাত দুটি বিচ্ছিন্ন করে ফেললো। তোমার কি কষ্ট হবে?

সোহান বিষয়টি অনুমান করার চেষ্টা করে। সে কল্পনা করে দুজন মোটা-সোটা লোক তার দুটি হাত ধরে ভীষণ জোরে টানা-হেঁচড়া করছে। এভাবে তার হাতদুটি দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা করছে। এটা কল্পনা করতেই তার মাথা ব্যাথা শুরু হয়ে যায়, তার ঠোঁট-মুখ বাঁকা হয়ে আসে। যেভাবে মৃত্যুর সময় তার মায়ের ঠোঁট-মুখ বাঁকা হয়ে গিয়েছিল। বিষয়টি অনুধাবন করে সোহান মৃত্যুদূতের দিকে তাকিয়ে বলে,

- হ্যাঁ হ্যাঁ কষ্ট পাবো। প্রচণ্ড কষ্ট পাবো।

- তাহলে বলো, তোমার দেহ থেকে যখন রুহ নামের এই অংগটি বিচ্ছিন্ন করা হবেতুমি কি কষ্ট পাবে না?

- হ্যাঁ হ্যাঁ কষ্ট তো পাবোই।

- মৃত্যুর সময় তো তাই হয়। মৃত্যু মানেই তো দেহ থেকে রুহ বিচ্ছিন্ন হওয়া। আল্লাহ বলেছেন, মৃত্যুর সময় ফেরেশতারা মানুষের দেহ থেকে রুহকে টেনে হেঁচড়ে বের করেন।

সোহান বিষয়টির ভয়াবহতা বুঝতে পারে। তার শরীরের একটা অংশকে টেনে হেঁচড়ে শরীর থেকে আলাদা করা হচ্ছে বিষয়টি কল্পনা করতেই তার লোম খাড়া হয়ে যায়। নিজের অজান্তেই বলে ওঠে,

- উহ! কী ভয়ংকর, কি কঠিন!

সোহানের মুখের দিকে তাকিয়ে নিয়ে মৃত্যুদূত আবার বলেন,

- তুমি যেমন ভাবছো ব্যাপার তার চেয়ে অনেক বেশি ভয়ংকর। দেখো, যে অঙ্গটি দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করা হচ্ছে সেটা যত বড় হবে কষ্ট কিন্তু তত বাড়বে। একটা আঙ্গুল কেটে ফেললে যে কষ্ট হবে একটা হাত কাটলে তার চেয়ে বেশি কষ্ট হবে। যদি জীবিত অবস্থায় কারো চামড়া ছিলে ফেলা হয় তবে কষ্ট হবে কয়েক হাজার গুন।

সোহান মৃত্যুদূতের দিকে উৎসুক দৃষ্টিতে তাকায়। পরের কথাগুলো শোনার জন্য অধির আগ্রহে অপেক্ষা করতে থাকেসে।

- মানুষের রুহ তার দেহের প্রতিটি কোনায় কোনায় বিস্তৃত। দেহের এমন কোনো অংশ নেই যেখানে রুহ উপস্থিত নয়। তাই রুহ যতদিন থাকে দেহের প্রতিটি অংগ ঠিকমত কাজ করে রুহ যখন থাকে না সবগুলো অংগ বিকল হয়ে যায়। এবার ভেবে দেখো, দেহ থেকে এই রুহকে যখন টেনে হেঁচড়ে বের করা হবে তখন কী ভীষণ কষ্ট হবে!

সোহান সন্ত্রস্ত হয়ে যায়। মনে হয় ভয়ে তার অন্তর ছিঁড়ে যাবে। সে ব্যাকুল হয়ে বলে,

- এ কষ্ট থেকে মুক্তি পাওয়া কোনো রাস্তা কি নেই!

- নিশ্চয় আছে। হাদীসে এসেছে মু'মিনের রুহ ফেরেশতারা যথাসম্ভব সহজভাবে কবজ করেন। আল্লাহ মু'মিনের মৃত্যু সহজ করেন।

- কীভাবে সহজ করেন?

প্রশ্নটি শুনে মৃত্যুদূত হালকা হেঁসে ওঠেন।

- কীভাবে করেন সেটা কী আর আমরা বলতে পারি? এই যেমন ধরো বাচ্চাদের

খাতনার সময় তার চোখের সামনে একটা সিদ্ধ ডিম উঁচু করে ধরা হয়, তাকে কিছু হাস্যকর কথা শোনানো হয়। এর মাঝে হঠাৎ তার চামড়াটা কেটে দেওয়া হয়। এতে তার কষ্ট কিছুটা কমে। তাই না?

সোহান মাথা নাড়ে। এ ঘটনা সে নিজে চোখে দেখেছে। তার নিজের ক্ষেত্রেও এটা ঘটেছে। তার স্পষ্ট মনে আছে। হাজাম যখন তার খতনা দিচ্ছিল তার দাদী পাশে বসে ছিলেন। দাদী বললেন,

- তোকে একটা সুন্দরী মেয়ের সাথে বিয়ে দেবো।

দাদীর কথা শুনে চারপাশের বাচ্চা ছেলেরা জোরে জোরে হেঁসে ওঠে। এর মাঝে কখন যে তার খতনা হয়ে যায় সে বুঝতেও পারে নি। কেবল পিঁপড়ার কামড়ের মতো একটা অনুভূতি হয়েছিল। মৃত্যুদূত বলতে থাকেন,

- হাদীসে বলা হয়েছে শহীদরা যখন মারা যায় তখন তাদের চোখের সামনে জান্নাতের সুন্দর সুন্দর সব নেয়ামত দেখানো হয়। সুন্দর বাড়ি, সুন্দরী স্ত্রী এই সব। এসব দেখে তাদের মন ভুলে যায়। মৃত্যুকষ্ট তাদের কাছে পিঁপড়ার কামড়ের মতো মনে হয়। মু'মিনদের মৃত্যু আল্লাহ এভাবে সহজ করেন।

সোহানের মনে কিছুটা সাহস ফিরে আসে। মৃত্যুর ভয়ানক কষ্ট থেকে বাঁচার কোনো রাস্তা আছে এটা জেনে সে স্বস্তি পায়। সোহানের মনে পড়ে তার এখনই বাড়ি ফেরা উচিৎ। সুন্দর উত্তরের জন্য মৃত্যুদূতকে ধন্যবাদ দিয়ে সে তড়িঘড়ি করে উঠে পড়ে।

- আমাকে এখনই বাড়ির দিকে রওয়ানা হতে হবে।

- না-না সেকি কথা! আজ রাতটা তো কমপক্ষে থেকে যাবে।

- তার কি আর উপায় আছে? নিপা কেঁদে-কেটে একাকার করবে যে।

- নিপা আবার কে?

- আমার ছোট্ট মেয়েটা।

কথাটি বলে, মৃত্যুদূতের দিকে দৃষ্টি ফেলে সোহান। সে দেখতে পায় বৃদ্ধের চেহারায় একটা কালো রেখা খেলা করছে। তার চেহারা দেখে সোহান অনেক কিছু আঁচ করতে পারে। তার মনে হয় এ লোকটা সম্পর্কে এখনও অনেক কিছু জানার বাকী আছে। শ্রদ্ধাবনত কণ্ঠে সে বলে,

- কিছু মনে না করলে বিদায় বেলা একটা আবদার করতে চাই।

কথাটি শুনে বৃদ্ধ মানুষটি খুব খুশি হয়েছে মনে হলো। ভীষণ উৎসাহ নিয়ে বললেন,

- বলো, তুমি কি চাও।

- আপনার ফাইলগুলোতে হাজারো মানুষের মৃত্যুর কাহিনী লিখেছেন। ঐ ফাইলগুলো সব তো আর আমার পক্ষে পড়া সম্ভব নয়। আপনার নিজের পরিবারের মৃত্যুর কাহিনী নিয়ে কিছু লেখা যদি আমাকে দিতেন তাহলে মনোযোগ দিয়ে পড়তাম।

সোহানের কথা শুনে বৃদ্ধ লোকটি অনেক্ষণ চুপ করে থাকলেন যেনো তিনি কোনো অতল সাগরে ডুবে গেছেন। কিছুক্ষণ পর তার হুশ ফিরলো বলে মনে হয়। সোহানকে কিছু না বলে খাটের নিচ থেকে ছোট একটা টিনের বাক্স বের করলেন। বেশ কিছুক্ষণ তার মধ্যে হাতড়িয়ে মাঝারি আকৃতির একটা লালচে খাতা বের করে সোহানের হাতে তুলে দিতে দিতে বললেন,

- আমার পরিবারের মৃত্যুর খবর তুমি কি ভাবে জানলে?

সোহান লক্ষ্য করে বৃদ্ধ লোকটির গলা ভেঙে গেছে। তার চোখ থেকে বিন্দু বিন্দু পানি গড়িয়ে পড়ছে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার জন্য সোহান জোর করে কিছুটা হেসে বলে,

- ওটা কি কঠিন কোনো ব্যাপার? যার পরিবার আছে সে কি নিজ হাতে রান্না করে খায়?

সোহানের কথা শুনে মৃত্যুদূতের ভাবাবেগে কোনো পরিবর্তন হয়েছে বলে মনে হলো না। তার চোখ থেকে একের পর এক পানির ফোটা নির্গত হয়ে মুখের ঘন দাড়ির মধ্যে হারিয়ে যাচ্ছে। পরিস্থিতি নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে দেখে সোহান তাড়াহুড়ো করে বিদায় নেওয়ার চেষ্টা করে।

- আমি তবে এখন যায়।

- আবার এসো বাবা। তোমার অপেক্ষায় থাকবো।

নিশ্চয় আসবো, অবশ্যই আসবো।

বলতে বলতে সোহান দ্রুত পায়ে বাড়ির দিকে রওয়ানা হয়ে যায়।

চার.

সোহানের ফিরতে দেরি দেখে বাড়ির সবাই চিন্তায় পড়ে যায়। স্কুল থেকে সাধারনত বিকালে বাড়ি চলে আসে। বাকিটা সময় বাড়িতেই কাটায়। নিপার সাথে কিছুক্ষণ গল্প-গুজব করে। মাধবী আর দাদীর কথার ফাঁকে ফাঁকে দু-একটা কথা বলে। কিন্তু আজ এশার আজানের পরও তার কোনো হদিস নেই দেখে মাধবীর মুখটা কেমন বিষন্ন হয়ে গেছে। সোহানের দাদীও দুঃচিন্তা করছেন না তা নয়। মাধবীর দিকে

তাকিয়ে তিনি বললেন,

- ছোড়াটা আজ আবার গেলো কোথায় রে?

মাধবী নিপাকে ভাত খাওয়াচ্ছিল। তার মুখে একগাল ভাত তুলে দিতে দিতে বলল,

- আমি কি আর জানি! রোজ তো বিকালে চলে আসে।

ঠিক তখনই দরজায় ঠক ঠক শব্দ শোনা যায়। সোহানের দাদী দরজা খোলার জন্য তাড়াহুড়া করে উঠে পড়েন।

- কে? আমার সোহান ভাই নাকি?

- হ্যাঁ দাদী। তাড়াতাড়ি খোলো। খুব খিদে পেয়েছে।

দরজা খুলতে খুলতে দাদী বলেন,

- খিদে পেয়েছে? সারাদিন খাসনি কিছু? আমি তো মনে করছি কোন নবাবের বাড়ি গিয়ে হয়তো পোলাও কোর্মা খাচ্ছিস!

কথা শুনে সোহান হেঁসে ফেলে।

- তোমাদের তাহলে এমনই মনে হয়? সবাইকে ফেলে আমি পোলাও কোর্মা খাবো?

পাশ থেকে মাধবী বলে,

- তা খেতে কতক্ষণ! সবাইকে ফেলে যখন সারাটা দিন বাইরে কাটাতে পেরেছো... ।

কথা শুনে সোহান হালকা শব্দে হাসতে থাকে। হঠাৎ তার চোখ পড়ে নিপার দিকে। ছোট্ট মেয়েটা গাপুস গুপুস করে খাচ্ছে। কি সুন্দর লাগছে! মাধবী আবার বলে,

- হাত মুখ ধুয়ে এসো। আমি খাবার দিচ্ছি।

হাত মুখ ধুয়ে এসে সোহান নিপার পাশে বসে। ততক্ষণে নিপার খাওয়া শেষ। মাধবী সোহানের সামনে খাবার এগিয়ে দেয়। সোহান গোগ্রাসে গিলতে থাকে। দাদী একটু দূরে বসে সব কিছু পর্যবেক্ষণ করতে থাকেন। খাবার খেয়ে সোহান ঘুমিয়ে পড়ে। মৃত্যুদূতের ডাইরীটি আজ আর পড়া হয় না তার। আজ সে ভীষণ ক্লান্ত।

পরদিন বেশ সকালে ঘুম ভেঙে যায় সোহানের। তার খুব মন খারাপ লাগে। মৃত্যুদূতের লাল ডাইরীটা হাতে নিয়ে বাড়ির ছাদে চলে যায়। ছাদের এক কোনে একটি বেতের চেয়ার পাতা রয়েছে। সোহানের মা এখানে বসতেন। চাকুরী পাওয়ার পর সোহান কিনে এনেছিলো চেয়ারটা। মাকে বলেছিলো,

- সারাটা জীবন তো অনেক কষ্ট করলে এবার তোমার বিশ্রামের পালা।

এসব কথা মনে করে সোহানের খারাপ মনটি আরো বেশি খারাপ হয়ে গেলো। সে আস্তে আস্তে বেতের চেয়ারটির দিকে এগিয়ে গেলো। চেয়ারটির উপর ময়লা জমেছে। সেই ময়লার উপরই বসে পড়ে সোহান। প্রথমেই লাল খাতাটি খুলে বিক্ষিপ্তভাবে পাতা উল্টাতে থাকে সে। গোটা গোটা হাতের লেখা। বেশিরভাগই কাটাকুটি করে মুছে ফেলা হয়েছে। এখানে সেখানে দু'একটি লাইন মাত্র অক্ষত আছে। সোহান বুঝতে পারে। কথায় পটু হলেও বৃদ্ধ লোকটি কোনো কিছু সাজিয়ে গুছিয়ে লিখতে দক্ষ নয়। সোহান এক দিক থেকে অক্ষত লাইনগুলো পড়তে শুরু করে।

- সত্যিই মর্মান্তিক ঘটনা। জানি না কেনো ঘটলো। কিভাবে লিখবো তাও বুঝতে পারছি না। লোকে বলে আমার দাদার পাপের ফলেই এটা ঘটেছে কিন্তু আমি তা বিশ্বাস করি না। কুরআন শরীফে স্পষ্ট লেখা আছে একজনের পাপের বোঝা আরেকজনের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয় না। আমার দাদা জমিদার ছিলেন। তিনি প্রজাদের উপর অনেক অন্যায় অত্যাচার করেছেন। কিন্তু আমি তো কিছুই করিনি। তাহলে আমি কেনো শাস্তি ভোগ করবো? এটা নিয়ে আমি অনেক ভেবেছি। পরে আমি নিজেকে নিজেই বুঝ দিয়েছি।

"জন্ম মৃত্যু আল্লাহর পরীক্ষা"

কুরআনে এভাবেই লেখা আছে। অতএব আমাকে মেনে নিতে হবে। এই কঠিন মর্মান্তিক ঘটনাটা মেনে নিতে হবে।

ছোট্ট ফুটফুটে একটা বাচ্চা আর তার মা আমার জীবনটাকে আলোকিত করে রেখেছিল। আমার যখন মন খারাপ হতো বাচ্চাটাকে কোলে নিলেই মন ভালো হয়ে যেতো। এটা আমি বারবার পরীক্ষা করে দেখেছি। যখন সে আব্বু বলে ডাকতো আবার মনে হতো জীবনে আর কিছুর দরকার নেই আমার।

এতদূর পড়তেই সোহানের চোখে পানি চলে আসে। কিছুক্ষণ বিরতি দিয়ে সে আবার পড়তে থাকে

- প্রথমে মনে হয়েছিল আমি পাগল হয়ে যাবো কিন্তু কুরআনের একটি আয়াত আমাকে রক্ষা করেছে।

"জীবন এবং সম্পদ কেড়ে নিয়ে মানুষকে পরীক্ষা করা হয়"

জানি না এ পরীক্ষায় আমি পাশ করতে পেরেছি কিনা। তবে এতটুকু ঠিক যে আমি চেষ্টা করেছি।

এরপর আরও বিভিন্ন কথা লেখা আছে। খন্ড খন্ড বিভিন্ন কাহিনী। বিভিন্ন কথা। সোহান সেগুলো এড়িয়ে যায়। মৃত্যুদূতের স্ত্রী-সন্তানের ব্যাপারে কি ঘটেছিল সেটা জানার জন্য খাতাটির এদিক ওদিক পৃষ্ঠা উল্টাতে থাকে। হঠাৎ তার নজরে পড়ে,

- অভিশপ্ত কলেরায় দুজনের মৃত্যু হয়। আমার মৃত মেয়েটিকে আমি কোলে নিয়েছিলাম। কি অসম্ভব ঠান্ডা ছিল তার গাঁ হাত-পা। তার চোখ দুটো বন্ধ ছিল। কেউ হয়তো ভাববে সে ঘুমিয়ে আছে কিন্তু আমি তো জানি তার কি হয়েছে। সে আর ঘুম থেকে উঠবে না। আমাকে আর আব্বু আব্বু বলে ডাকবে না।

সোহান আর পড়তে পারে না। তার চোখ ঝাপসা হয়ে আসে। অন্তরের মধ্যে ভয়ংকর আতংক দানা বাঁধে। চোখের সামনে মাধবী আর নিপার মুখ ভেসে ওঠে। তার মনে হয় এরা হয়তো তাকে ফেলে মৃত্যুপূরীর দিকে যাত্রা করবে। সে হাউ হাউ করে কেঁদে ওঠে। তার কান্না শুনে মাধবী ছুটে আসতে চায় কিন্তু সোহানের দাদী বাধা দিয়ে বলেন,

- এতীম ছেলেটা হয়তো মায়ের কথা মনে করে কাঁদছে তাকে বাঁধা দিয়ো না। কাঁদলে মন হালকা হয়।

এই ঘটনার পর সোহান অস্বাভাবিক আচরণ করতে থাকে। তার নাওয়া-খাওয়া, ঘুম সব কিছুতে অনিয়ম শুরু হয়। কথা-বার্তাও অগোছালো হয়ে যায়। একদিন বললো,

- দাদী তুমি কবে মরবে? তুমি মরলে আমি খুশি হবো।

কথা শুনে তার দাদী ফুপিয়ে কেঁদে ওঠে। মাধবী বলে,

- আপনি ওর কথায় কাঁদছেন। আমার তো মনে হয় ওর মাথায় ঠিক নেই।

- আমি কি আর মরে যাওয়ার কথা শুনে কাঁদছি। ওর মাথায় ঠিক নেই বলেই তো কাঁদছি। ছেলেটা কি শেষ-মেষ পাগল হয়ে গেলো?

বলে আরো জোরে কেঁদে ওঠে সোহানের দাদী।

অবস্থা আরো বেশি খারাপ হলো। মাধবীর বাবা আর বড় ভাই আসে সোহানকে দেখতে। শশুরকে দেখে সোহান বলে,

- আপনার মেয়েকে বাড়ি নিয়ে যান।

সোহানের শশুর অভিজ্ঞ লোক। তার কথায় তিনি রাগ করেন না। তিনি বুঝতে পেরেছেন ছেলেটার মাথায় সমস্যা হয়েছে। নিরসভাবে তিনি বলেন,

- আমার মেয়েকে নিয়ে গেলে তোমার মেয়েকে খাওয়াবে কে?

সোহান কথাটির গুরুত্ব বুঝতে পারে। একবার নিপার দিকে মুখ তুলে তাকায়। তারপর আবার তাড়াতাড়ি মুখ নামিয়ে নেয়। যেনো ভয় হচ্ছে মেয়েটি এখনই তার সামনে ছটফট করে মরে যাবে।

- নিয়ে যান সবাইকে নিয়ে যান। কাউকে আমার দরকার নেই। কেউ আমার নয়।

সোহানের চিৎকার শুনে সবাই বুঝতে পারে তার মাথার সমস্যা ক্রমেই বাড়ছে। তারা সবাই মিলে পরামর্শ করে সোহানকে একজন ভাল মানসিক ডাক্তারের কাছে নিয়ে যায়। ডাক্তার সাহেব সোহানকে প্রশ্ন করেন,

- তোমার কি সমস্যা?

তার দিকে তাকিয়ে সোহান হো হো করে হেঁসে বলে,

- আমার আবার কি সমস্যা? আমার কোনো সমস্যা নেই। সমস্যা তো আপনাদের।

ডাক্তার সাহেব এমন ভাব দেখান যেনো তিনি সোহানের কথায় খুব গুরুত্ব দিচ্ছেন,

- আমাদের কি সমস্যা?

- আপনারা সবাই মারা যাবেন। মরে ভুত হয়ে যাবেন। একটা মানুষও বাঁচবে না।

- তাতে তোমার কি?

- তাতে আমার কি মানে? সবাই মরে গেলে আমি কাকে নিয়ে বাঁচবো?

কথাটি বলে, হাউ হাউ করে কেঁদে ওঠে সোহান।

ডাক্তার সাহেব ব্যাপার কিছুটা আচ করতে পারেন। স্বাভাবিকভাবে বলেন,

- এটা কোনো চিন্তার বিষয় হলো? সবাই মারা গেলে তুমিও তো মারা যাবে তাই না?

কথাটি শুনে সোহান যেনো আতংকিত হয়ে যায়। তার মনে পড়ে মৃত্যুর সময় ভয়ংকর কষ্টের কথা। সে ব্যস্ত হয়ে বলে,

- না-না। আমি মরবো কেনো? আমি বেঁচে থাকবো।

কথাটি বলেই সোহান ডাক্তার সাহেবকে অনুনয় করে বলে,

- আপনার কাছে কি এমন কোনো ঔষধ আছে যা মৃত্যুকে ঠেকাতে পারে?

ডাক্তার সাহেব বুঝতে পারেন মৃত্যুর চিন্তায় ছেলেটিকে ভারসাম্যহীন করে ফেলেছে। তার মনে হয় এই মুহূর্তে এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেওয়া ঠিক হবে না। তিনি মাথা ঝাকিয়ে বলেন,

- হ্যাঁ হ্যাঁ। অবশ্যই আছে। আছে বলেই তো আমি এতদিন বেঁচে রয়েছি। দেখছো না।

তার কথা শুনে সোহান আশ্বস্ত হলো বলে মনে হ না। সে সন্দেহের চোখে ডাক্তার সাহেবের দিকে তাকিয়ে বলল,

- আপনার বাবা কি বেঁচে আছেন?

ডাক্তার সাহেব কিছুক্ষণ ইতস্তত করে বললেন,

- কেনো, সেটা জেনে তোমার কি লাভ?

কিছুটা শ্লেষ মিশ্রিত কণ্ঠে সোহান বলে,

- আপনি মৃত্যুকে ঠেকানোর ঔষধ বিক্রি করবেন আর নিজের বাবাকে বাঁচাতে পারবেন না তা কি হয়?

ডাক্তার সাহেব আর কোনো কথা বাড়ান না। কেবল একটা কাগজের উপর খস খস করে কিছু ঔষধ লিখে দেন।

পরের দিনগুলোতে সোহানের অবস্থার কোনো উন্নতি হয় না। সকালে ভাত খেয়ে বের হয়ে যায় আবার রাতে বাড়ি এসে ভাত খায়। সারাদিন বাড়ি ফেরে না। সংসারে শুরু হয় অশান্তি আর দুশ্চিন্তা। সোহান সব সময় উদাস মনে থাকে দেখে মনে হয় কিছু একটা ভাবছে। মাধবীর সাথে কথা বলে না। নিপাকে কোলে নিয়ে আদর করে না। কিছু দরকার হলে কেবল দাদীর কাছে চায়। একদিন দাদীকে বলল,

- দাদী কোনো চিন্তা করবা না। আমি এমন একটা ঔষধ তৈরী করবো যেটা খেলে কেউ মরবে না। দুনিয়ার সবাই বেঁচে থাকবে।

তার কথা শুনে দাদী ভীষণ চিন্তায় পড়ে যান। তার ভিতরটা ডুকরে কেঁদে ওঠে। ছেলেটা কি আর কখনও ভাল হবে না!

একদিন সোহানের মাথায় একটা বুদ্ধি আসে। তার মনে হয় একটি পদ্ধতিতে মৃত মানুষকে জীবিত করা যায়। তার মনে হয় ব্যাপারটা নিয়ে মৃত্যুদূতের সাথে আলাপ করা দরকার। তার মতামত নেওয়া দরকার। সে তৎক্ষনাৎ রওয়ানা হয়ে যায়। এবারের ট্রেন ভ্রমণটা অন্যরকম হলো। এর আগে সোহান ট্রেন ভ্রমণের সময় জানালা দিয়ে তাকিয়ে থাকতো। দেখতো মানুষের জীবন কত সুন্দর। সারি সারি গাছ আর ঝাঁক ঝাঁক পাখি দেখতো। নীল আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতো। এবার সে জানালা দিয়ে তাকাতে পারে না। কোনো কিছুকে তার নিকট সুন্দর মনে হয় না। কেবলই মনে হয় এসব অর্থহীন। এসবের কোনো মূল্য নেই। সব মারা যাবে, শেষ হয়ে যাবে। তার ভিতরে জিদ তৈরী হয়। “মৃত্যুকে প্রতিহত করতে হবে”।

মৃত্যুদূত বাড়িতেই ছিলেন। সোহানকে দেখে তিনি বিশ্ময়ে আবিভূত হয়ে যান।

- তুমি তাহলে আবার এসেছো? বসো।

- দেখুন বসার সময় নেই আমি একটা জরুরী কাজ নিয়ে এসেছি। মৃত্যুকে কিভাবে প্রতিহত করা যায় সে ব্যাপারে আমি একটা গবেষণা করেছি।

সোহানের একটি কথায় মৃত্যুদূত অনেক কিছু আচ করতে পারেন। তিনি মানুষে জীবন মত্যু নিয়ে গবেষণা করে সারাটা জীবন কাটিয়েছেন। তার কাছে কিছু গোপন

থাকার কথা নয়। তিনি বেশ আগ্রহ প্রকাশ করে বলেন,

- তাই নাকি! তোমার গবেষণাটা বুঝিয়ে বলো দেখি।

বৃদ্ধের আগ্রহ দেকে সোহান আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠে। সে বেশ উৎসাহ নিয়ে বলে,

- দেখুন, ব্যাপারটি খুব সহজ। একজনের মৃত্যুর পর যদি অন্য কারো রুহ টেনে হেঁচড়ে বের করে তার দেহে ঢুকিয়ে দেওয়া হয় তাহলে তো সে বেঁচে যাবে, তাই না? এই যেমন ধরুন, আমার মৃত্যুর পর আপনার রুহ খুলে নিয়ে আমার দেহে ঢুকিয়ে দেওয়া হলো!

সোহানের কথা শুনে মৃত্যুদূত হাসেন না। তিনি জানেন কথাটি তার কাছে হাস্যকর মনে হলেও সোহানের কাছে হাস্যকর নয় তাই কেবল হাসলে হবে না যুক্তি দিয়ে তাকে বোঝাতে হবে। তিনি নিজের চেহারায় কৃত্রিম আগ্রহ ধরে রেখে বলেন,

- তোমার প্রস্তাবটি খুবই সুন্দর। আমি এটাকে সমর্থন করছি। কিন্তু বেশ কিছু জায়গায় কিছুটা সংশোধন করা দরকার।

সোহান এবার মৃত্যুদূতের কথা শোনার জন্য কৌতুহলী হয়ে ওঠে। সে কান পেতে থাকে। মৃত্যুদূত বলতে থাকেন।

- দেখো, একজন জীবিত মানুষের দেহ থেকে তার রুহ কিভাবে টেনে হেঁচড়ে বের করবে সেটা ভেবে দেখেছো?

সোহান মাথা নেড়ে অসম্মতি জানায়। সে এই বিষয়টা ভেবে দেখেনি। কোনোরূপ বিরতি না নিয়েই মৃত্যুদূত বলতে থাকেন,

- তাছাড়া আমার রুহ তোমার শরীরে প্রবেশ করালে তো সেই মানুষটা হবো আমি। তোমার দেহের মধ্যে আমি জীবিত থাকবো। তুমি নও।

সোহান ব্যাপারটি বুঝতে পারে। সে হতাশ কণ্ঠে বলে,

- এসব তো আমি ভেবে দেখিনি।

মৃত্যুদূত আবার বলেন,

- তুমি আরো একটা বিষয় ভেবে দেখো নি।

এরপর বৃদ্ধ একটি দীর্ঘশ্বাস ভেলে বলেন,

- মৃত্যুকে প্রতিহত করে কী লাভ?

সোহান এবার ঘোরতর আপত্তি জানায়। বেশ উত্তেজিত হয়ে বলে,

- কী লাভ মানে? অনেক লাভ। মৃত্যু একটা সমস্যা। সেই সমস্যা থেকে দুনিয়ার

মানুষ বেঁচে যাবে এতে লাভ নেই?

- তোমাকে বুঝতে হবে, বাছা। মৃত্যু দুনিয়াতে একমাত্র সমস্যা নয়। তুমি কি কখনও কোনো মানুষকে আত্মহত্যা করতে দেখেছোবা শুনেছো?

সোহান সম্মতি জানায়। সে দেখেনি তবে শুনেছে। তার জ্ঞান হওয়ার পর তাদের পাড়ার দুজন লোক আত্মহত্যা করে মারা গিয়েছে।

- এরা আত্মহত্যা কেনো করে? নিশ্চয় তাদের এমন কিছু সমস্যা রয়েছে যা তাদের দৃষ্টিতে মৃত্যু অপেক্ষা ভয়ংকর। তাই না?

সোহান সম্মতি সূচক মাথা নাড়ে বটে কিন্তু ব্যাপারটি তার নিকট এখনও পুরোপুররি বোধগম্য নয়। যেনো সে চিন্তা করছে, মৃত্যুর চেয়ে বেশি ভয়ানক আবার কি হতে পারে।

- তোমাকে একটা উদাহরণ দিয়ে বোঝায়। ধরো এই বড়িটা চুষে খেয়ে নিলে আর তোমার মৃত্যু হবে না।

বলে একটা টেবলেট সোহানের হাতে তুলে দেয় মৃত্যুদূত। সোহান এমনভাবে সেটা গ্রহণ করে যেনো আসলেই সেটা মৃত্যুকে প্রতিহত করতে পারে।

- ধরো তুমি এখন এই বড়িটি গিলে খেয়ে নিলে। তুমি নিশ্চিততোমার আর মৃত্যু হবে না। কিন্তু এখান থেকে বাড়ি যাওয়ার সময়ট্রেনের নিচে পড়ে তোমার দুটি পা কেটে গেলো। তোমার মৃত্যু হলো না কিন্তু তুমি পঙ্গু হয়ে গেলে। এভাবে বেঁচে থাকতে তোমার কেমন লাগবে?

সোহানের মুখ কালো হয়ে যায়। তাড়াতাড়ি করে সে মৃত্যুর টেবলেটটি মৃত্যুদূতের হাতে তুলে দেয়। মনে হয় মৃত্যুকে ঠেকানোর আর কোনো প্রয়োজন নেই। টেবলেটটি হাতে নিয়ে বৃদ্ধ বলেন,

- অনেক আগে একবার পেপারে একটা ঘটনা লেখা হয়েছিল। আমার ফাইলে সেটা সংরক্ষিত আছে। একজন লোক ক্ষুধার যন্ত্রনায় ছটফট করছিল। তার কোনো খাবার ছিল না তাকে খাওয়ানোর মতো লোক ছিল না। লোকটা বলছিল, "আমাকে মেরে ফেলো, আমাকে খুন করো"। কিছুক্ষণ পর সে মারা যায়।

ঘটনাটি বলে মৃত্যুদূত সোহানের দিকে তাকিয়ে তার মনের ভাব বুঝার চেষ্টা করে। বোঝা যায় সে বুঝতে পারছে। জীবনকে সে ভালভাবে চিনে নেওয়ার চেষ্টা করছে। মানুষের জীবনে কত বিপদ-আপদ আসতে পারে সে একটা একটা করে গুনে দেখছে। মৃত্যুদূত তাকে প্রশ্ন করেন,

- বলো তো, এই ক্ষুধার্ত লোকটির যদি মৃত্যু না হতো তবে কি তার কোনো কল্যাণ

হতো?

সোহান মাথা নাড়ে। তার মনে হয় যার জীবন একটা অগ্নি গহ্বরে পরিণত হয় মৃত্যু তার মুক্তির দ্বার। তাই মৃত্যুকে দুনিয়া থেকে বিদায় করে দেওয়ার মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই। মৃত্যুদূত এবার আসল কথায় ফিরে আসেন,

- চিরকাল বেঁচে থাকার জন্য এমন একটা জীবন দরকার যেখানে কোনো দুঃখ কষ্ট নেই কোনো চিন্তা নেই। পুরোপুরি নিরাপদ, কোনো ভয় নেই, ঝুট-ঝামেলা নেই। এমন একটা জীবন যখন থাকবে কেবল তখনই মৃত্যু না থাকাটা একটা সৌভাগ্য বলে গণ্য হবে।

ভীষণ আগ্রহ নিয়ে সোহান বলে ওঠে,

- এমন কোনো জীবন কি আছে?

- নিশ্চয় আছে। সেটা হলো মৃত্যুর পরের জীবন।

মৃত্যুদূতের এই কথাটি সোহান এখনও পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারে না।

- মৃত্যুর পরে আবার কিভাবে জীবন হবে? মৃত্যু তো জীবনকে শেষ করে দেয়।

- কে বলল, মৃত্যু জীবনকে শেষ করে দেয়!

সোহান খুব সহজভাবে বলে,

- শেষ নয় তো কি? একটা মানুষ মরার পর পচে গলে শেষ হয়ে যায়। তার জীবন শেষ হয়ে যায় না?

বৃদ্ধ হালকা হেসে ওঠেন,

- তোমাকে জীবন মৃত্যুর পার্থক্য শিখিয়েছিলাম। মনে আছে? বলো তো জীবন কি?

- জীবন হলো রুহ। যাকে আমরা বলি প্রাণ।

কয়েক বার মাথা ঝাঁকিয়ে নিয়ে মৃত্যুদূত বলেন,

- মৃত্যুর সময় কি জীবন শেষ হয়ে যায়? মানুষের রুহ কি তার হাড়, চামড়া আর মাংসের সাথে পচে গলে যায়?

সোহান এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পারে না। মৃত্যুদূত বলতে থাকেন,

- নবীদের মধ্যে একজন নবী আছেন যাকে রুহ উপাধী দেওয়া হয়েছে। তার নাম জানো?

সোহান মাথা নাড়ে। সে জানে না। এ বিষয়ে সে কখনও পড়াশুনা করে নি।

- তিনি ঈসা (আ:)। আল্লাহ পাক নিজে তাকে রুহ উপাধি দিয়েছেন। তার কাহিনীর সাথে রুহের ঘটনার অনেক মিল আছে। ইয়াহুদীরা যখন ঈসা নবীকে হত্যা করতে রওয়ানা হয়। আল্লাহ তাকে আকাশে তুলে নেন আর অন্য একজনের চেহারাকে দেখতে হুবহু ঈসা নবীর মতো করে দেন। ইয়াহুদীরা সেই নকল ঈসাকে শুলে চড়ালো, তাকে হত্যা করলো। সবার চোখের সামনে সে মারা গেলো। তার লাশ পচে গলে শেষ হয়ে গেলো। সবাই বলল, ঈসা নবী মরে গিয়েছেন তিনি শেষ হয়ে গিয়েছেন। কিন্তু আসলে কি ঈসা নবী শেষ হয়ে গিয়েছেন?

সোহান মাথা নাড়ে।

- না-না, তাকে তো তুলে নেওয়া হয়েছে।

- একইভাবে মৃত্যুর সময় রুহকে দেহ থেকে বের করে নেওয়া হয়। একথা আমি তোমাকে আগে বলেছি। কি বলি নি?

- হ্যাঁ হ্যাঁ আপনি বলেছেন। আমার মনে আছে।

- মানুষ যখন কবরে মৃত্যু লাশ কবর দেয় তার মধ্যে কি রুহ থাকে?

সোহান একটু চিন্তা করে নিয়ে বলে,

- না-না সেখানে থাকে কেবল, হাড়,চামড়া আর মাংশ। রুহ তো আগেই সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।

মৃত্যুদূত এবার পুরো ব্যাপরটি খোলোসা করে বলেন,

- তাহলে আমরা কেবল মানুষের দেহের হাড়, চামড়া আর মাংসের গলে যাওয়া দেখি। এসব পচে গলে শেষ হয়ে যায়। রুহ অর্থাৎ মানুষের প্রাণ বা জীবন কিন্তু অরক্ষিত থাকে। জীবন শেষ হয়ে যায় না। মৃত্যুর সময় ফেরেশতারা সেটাকে টেনে হেঁচড়ে দেহ থেকে বের করে নেয়। কিয়ামতের দিন আবার সেটাকে নতুন দেহতে ঢুকিয়ে দেওয়া হবে। তারপর আর কখনও মৃত্যু হবে না। দুনিয়াতে যারা আল্লাহর কথা মেনে চলেছে, তার ইবাদত করেছে তারা সেই নতুন জীবনে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তারা সেখানে অনন্ত কাল ধরে শান্তিতে থাকবে, নিরাপদে থাকবে। কোনো বিপদ আপদ তাদের স্পর্শ করবে না। দুনিয়াতে স্ত্রী-কন্যা, বাবা-মা, আত্মীয় স্বজন যারাই মারা যাবে। যদি তারা জান্নাতী হয় তবে আল্লাহ আবার তাদের একটি পরিবার হিসেবে বাস করার সুযোগ দেবেন। একটা সুখের সংসার হবে।
- সোহানের মনে হয় সব কিছু তার কাছে স্পষ্ট প্রকাশিত হয়ে গেছে। তার ভিতর থেকে সব আতংক দূর হয়ে যায়। সব হতাশা শেষ হয়ে যায়। অনেকটা স্বয়ংক্রিয়ভাবে সে বলে ওঠে,
- তাহলে তো মৃত্যু কঠিন কিছু নয়! মৃত্যু থেকে পালিয়ে বেড়ানোর কিছু নেই।

লেখকের অন্যান্য বই

*** গ্রন্থাবলী:**

১. আল-ইতকান ফী তাওহীদ আর-রহমান (তাওহীদ সম্পর্কে)
২. আদ-দালালাহ্ আ'লা বিদয়াতে দ্বলালাহ্ (বিদয়াত সম্পর্কে)
৩. ভেজালে মেশাল (গণতন্ত্র সম্পর্কে ইসলামের রায়)
৪. মাজহাব বনাম আহলে হাদীস
৫. আসবাবুল খিলাফ ওয়াল জাব্বু আনিল মাজাহিবিল আরবায়া (আরবী)
৬. নাফউল ফারীদ ফী জিল্লি বিদাইয়াতিল মুজতাহিদ (উসুলে ফিকহ)
৭. হুসাইন ইবনে মানছুর আল-হাল্লাজ; কথা ও কাহিনী
৮. হরিণ নয়না হুরদের কথা (জান্নাতের স্ত্রীদের বর্ণনা)
৯. আল-ই'লাম বি হুকমিল কিয়াম (কারো সম্মানে দাঁড়ানো বা মীলাদে কিয়াম করার বিধান)
১০. চাঁদ দেখা প্রসঙ্গে
১১. ডাঃ জাকির নায়েক সম্পর্কে কিছু কথা
১২. আত-তাবঈন ফী হুকমিল উমারা ওয়াস সালাতীন
১৩. দরবারী আলেম
১৪. মারেফাত
১৫. লাইলাতুল বারায়াহ্
১৬. হিদায়া কিতাবের অপূর্ব হেদায়েত (প্রফেসর শামসুর রহমান লিখিত 'হিদায়া কিতাবের একি হিদায়াত!!'' বইয়ের জবাব)

*** রিসালাহ্ (সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ):**

১৭. ছোটদের আক্বাইদ
১৮. সংক্ষেপে যাকাতের মাসয়ালা মাসায়েল
১৯. তারাবীর সলাতে পারিশ্রমিক গ্রহণের বিধান (আরবী)
২০. মাসায়িলুল ই'তিকাফ (আরবী)
২১. সংশয় নিরসন

*** ইসলামী উপন্যাস ও কবিতা:**

২২. আরব মরুতে শিক্ষা সফর (গণতন্ত্রের স্বরূপ উন্মোচন)
২৩. মৃত্যুদূত (মৃত্যুর ভয়াবহতা ও মৃত্যুর পরের জীবন)
২৪. কল্পিত বিজ্ঞান (বিবর্তবাদ ও নাস্তিকতার খন্ডায়ন)
২৫. পরিবর্তন (নিজের জীবন ও সমাজে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করার সংকল্প)
২৬. ছোটনের রোজী আপু (কিশোর উপন্যাস)
২৭. সান্টু মামার স্কুল (কিশোর উপন্যাস)
২৮. কবিতায় জান্নাত (কবিতার ছন্দে জান্নাতের বর্ণনা ও ব্যাখ্যা)
২৯. নাস্তিকতার অসারতা (গল্পের সাহায্যে নাস্তিকদের মতবাদ খন্ডায়ন)
৩০. বায়াত (কোন বায়াত? কিসের বায়াত?? কার হাতে বায়াত???)
৩১. কল্পনায় জান্নাত (কবিতা গ্রন্থ)

*** ভাষা শিক্ষা:**

৩২. তাইসীরুল ক্বওয়ায়িদ (আরবী গ্রামার)
৩৩. আরাবিয়্যাতুল আতফাল (ছোটদের আরবী শিক্ষা)

প্রকাশের অপেক্ষায়

১. শান্তি ও সন্ত্রাস (গবেষণা গ্রন্থ)   ২. ইনসাফ (গবেষণা গ্রন্থ)